ভবিষ্যৎ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দাম—২৷৹

শ্রীরণেন্দ্রকুমার শীল কর্ত্তৃক পর্ণ কুটীর ৬, কামার পাড়া লেন, বরাহনগর
হইতে প্রকাশিত ও ভোলানাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৬৮, সিমলা ষ্ট্রীট
হইতে শ্রীসূর্য্য কুমার মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান্ স্নেহাংশুকান্ত আচার্য্য

প্রাণাধিকেষু

জানুয়ারী ১৯৪৫

এই পুস্তকটির সমস্ত কাগজ
সরবরাহের জন্য ভোলানাথ
দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড-এর
অন্যতম সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত
বীরেশ্বর দত্ত মহাশয় আমার
আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

প্রকাশক

এক

দু'জনে হঠাৎ দেখা! রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে খাঁচার পাখী ছিল খাঁচায় আর বনের পাখী বনে—তার পর কি ছিল বিধাতার মনে, দু'জনে দেখা…ঠিক তারি মতো!

দু'জন মানে, তরুণী জাহ্নবী আর তরুণ আদিত্য।

জাহ্নবীর বয়স তেইশ বছর। বাঙলা উপন্যাসে সে বসিবে নায়িকার আসনে, এমন বাসনা বা কল্পনা তার মনে কখনো উদয় হয় নাই! জাহ্নবীর বাবা চিন্তাহরণ লোহার কারবারে অগাধ পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছেন। কারবারের উপর তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা। সংসারে জাহ্নবী…ঐ একটিমাত্র মেয়ে। মেয়ের ভার মেয়ের মা গিরিবালা দেবীর উপর। কাজেই কারবারের উপর মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া চিন্তাহরণের দিন কাটিতেছিল নিশ্চিন্ত ভাবে; মেয়ের কথা চিন্তা করিতেন না। আট বৎসর পূর্ব্বে গিরিবালা দেবী একবার তাঁকে

মেয়ের সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছিলেন—মেয়ে ডাগর হলো, তার বিয়ের ব্যবস্থা করো। এ কথায় চিন্তাহরণ বলিয়াছিলেন, ঘটক লাগিয়ে স্তাখো। তারা টাকা যা চায়,—তোমাদের মত হলেই চেক্ ফেলে দেবো!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি লোহা-লক্কড়ের বাজার লইয়া রহিলেন; ঘটক-ঘটকীর মারফৎ গিরিবালা দু'-তিনটি পাত্রের সন্ধান পাইলেন। চিন্তাহরণের পয়সা এবং ঐ একটিমাত্র কন্যা দেখিয়া তাদেরো চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু সে সব সম্বন্ধ ফাঁশিয়া গেল কোষ্ঠীর চক্রান্তে।

গিরিবালার বাবা অর্থাৎ জাহ্নবীর দাদা-মশায় ছিলেন ভয়ানক গোঁড়া। পাঁজি ছাড়া এক-পা চলিতে নারাজ। রাশিচক্র মিলাইয়া বিবাহ দিতে না পারিলে কি বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বহু কাহিনী বলিয়া গিরিবালার মনে তিনি এমন বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিলেন যে, মেয়ের বিবাহের নামে আতঙ্কে মায়ের প্রাণ যাইবার জো! কেহ পাত্রের কথা বলিলে তাঁর মনে হয় বুঝি কেতুকে ভর করিয়া মঙ্গল রাশি মেয়ের সর্ব্বনাশ-সাধনের সঙ্কল্প লইয়া দ্বারে উপস্থিত!

কোষ্ঠীর বিচার করিতে করিতে মেয়ে জাহ্নবীর বয়স পনেরোর কোঠা পার হইয়া ষোলয় গিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালার বাবার হঠাৎ ইহলোকের মেয়াদ গেল চুকিয়া! রাশি-চক্রের আবর্ত্তের মধ্যে মেয়ে গিরিবালা এবং দৌহিত্রী জাহ্নবীকে রাখিয়া তিনি বিদায় লইলেন! বাপেতে-মেয়েতে বসিয়া জ্যোতিষীদের লইয়া কোষ্ঠীর যে আসর জমাইয়া ছিলেন, সে আসর-আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ পড়িল।

ঘটক-ঘটকীরা কিন্তু এ-বাড়ীর মায়া ছাড়িল না। ভোজের গন্ধ

পাইলে কুকুর-বিড়ালরা যেমন আশে-পাশে বিচরণ করিতে থাকে, ঠিক তাদের মতোই ঘটক-ঘটকী এবং পাত্রের দল এ-বাড়ীর মায়ায় মজিয়াছিল। কিন্তু বাবা নাই, পাত্রদের কোষ্ঠীর সহিত মেয়ে জাহ্নবীর কোষ্ঠী মিলাইয়া কে করিবে মিলনের ভবিষ্যৎ-বিচার! চিন্তাহরণের অবসর নাই—ইনভয়েস আর হিসাবের কাগজে ডুবিয়া আছেন! কাজেই উৎসাহের সঙ্গে গিরিবালার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিও কেমন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে!

হঠাৎ একদিন দুপুর-বেলায় আবার তাঁর চমক ভাঙ্গিল। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া যাহোক একখানা বাঙলা উপন্যাস খুলিয়া তাহারি পাতায় চোখ বুলাইতে-বুবাইতে গিরিবালা নিদ্রা-সাধনা করেন—তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। সেদিন মেয়ের টেবিলের উপর একখানা বাঙলা উপন্যাস দেখিয়া সেখানা আনিয়া তার পাতা খুলিবামাত্র উপন্যাসের ভিতর হইতে চিঠি বাহির হইল। বাঙলায় লেখা চিঠি। হাতের লেখা জাহ্নবীর। মেয়ে কা'কে চিঠি লিখিল?

গিরিবালা চিঠি পড়িল। জাহ্নবী লিখিয়াছে—

অলখ নিরঞ্জন

আমাকে চিঠি লিখিয়া দুঃখ জানানো মিথ্যা! বাঙালীর ঘরের মেয়ে,—জানো তো, আমরা কতখানি পরাধীন! আমিও কি তোমাকে ভালোবাসি না? খুব ভালোবাসি। আমার নিরালা মনে তোমাকেই পাইয়াছি প্রথম সঙ্গী, সহচর! আমার পানে আরো অনেকে হয়তো চোখ তুলিয়া চাহিয়াছে—কিন্তু তাদের সে-চাওয়ায় নিজের নিঃসঙ্গতা, নিজের চাওয়া-পাওয়ার কথা মনে জাগে নাই! তোমার কি-বা জানি! সামনে ঐ মেশের বাসায় থাকো—কলেজে পড়ো—জানলার ধারে বসে

বাঁশী বাজাও,—আমি বসে সে-বাঁশী শুনি। ভালো লাগে, তাই শুনি; বাঁশীর ও-স্বরে মনে হয়, কোথাও যেন আমার কেউ নেই! যেদিন দেখলুম তোমার চোখে আকুল দৃষ্টি, সেদিন মনে হলো ও-দৃষ্টি যেন আমাকে খুঁজেই অতখানি আকুল! তুমি লিখেছো আমাকে ভালো-বাসা জানাবার তোমার যে-স্পর্দ্ধা, সে-স্পর্দ্ধা যেন আমি ক্ষমা করি—তোমাকে নিরুপায় অসহায় বুঝে! কি করে তোমাকে জানাবো, এ-বয়সে আমাদের মন ভালোবাসার জন্য কতখানি কাঙাল হয়? এ তোমার স্পর্দ্ধা নয়, প্রিয়!

আমার সাধ যায় না ভাবো, আর পাঁচ জনের মতো এ-বয়সে আমিও বৌ হয়ে স্বামীর ভালোবাসায় নিজেকে সঁপে দি?

বাবার সঙ্গে দেখা করবে কিনা, জিজ্ঞাসা করেছো! কিন্তু আমাদের বাড়ীতে কোষ্ঠীর উপরে সকলের অগাধ বিশ্বাস! কোষ্ঠী না মিললে প্রিন্স-অফ-ওয়েল্‌স্ এসে যদি আমার পাণি-প্রার্থী হয়, তবু এঁরা আমাকে তার হাতে দান করবেন না। এই সঙ্গে আমার রাশি-চক্র নকল করে পাঠাচ্ছি—এ রাশিচক্রের সঙ্গে মিলিয়ে কোনো জ্যোতিষীকে দিয়ে তোমার একটা ভালো রাশিচক্র তৈরী করে যদি ঘটকের হাতে পাঠাতে পারো, তবেই আমাদের মিলন সম্ভব,—নাহলে দু'পারে বসে দু'জনের হা-হুতাশই শুধু সার হবে!

বাবা চান্ জামাই হবে বড়লোক—তার মোটর থাকবে, পয়সা থাকবে! বাবার অনেক পয়সা—সহরে তাঁর নাম-ডাক আছে!

এই পর্য্যন্ত লেখা। চিঠি শেষ হয় নাই। রাশিচক্রের নকল তুলিয়া

দিলেই চিঠি শেষ হইবে এবং ডাকের মারফৎ চিঠি গিয়া যে মেশের ছেলে নিরঞ্জনের হাতে উঠিবে, গিরিবালার তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না।

বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলেন! তাঁর দু'চোখ উঠিল কপালে ...শরীর রোমাঞ্চ-রেখায় কণ্টকিত!

চিন্তাহরণের উপর রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। ব্যবসা করিতেছে! পয়সা রোজগার! এ পয়সায় মান-ইজ্জৎ কোথায় থাকিবে...মেয়ে যদি...

মেয়ের কি দোষ? বয়স হইয়াছে...এ-বয়সে ঐ যে লিখিয়াছে নিরালা মন...সাথী খুঁজিয়া আকুল! লেখাপড়া শিখিয়াছে...নাটক-নভেল পড়ে...সিনেমার ছবি দেখে...এত বয়সেও বিবাহ না দিয়া ঘরে পুরিয়া রাখিবে যদি,কেন তবে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলে? নাটক-নভেল পড়িতে মানা করো নাই কেন? সিনেমা দেখিতে দাও কেন? লোহার ব্যবসা করিয়া সেই লোহার নীচে মনটাকে চাপা দিয়া একেবারে চুর করিয়া বসিয়াছ!

আড়ালে মেয়েকে ডাকিয়া সাবধানে অনেক জেরা করিলেন—কোথাকার কে অজানা ছেলে...মেশে থাকে...কোথায় বাড়ী...কে আছে...অবস্থা কেমন...স্বভাব-চরিত্র কেমন...জানা নাই, শুনা নাই তাকে এমন করিয়া চিঠি লেখা...এ-চিঠি সে যদি পাঁচজনের কাছে দেখাইয়া দুর্নাম রটাইয়া বেড়ায়, তখন...

জাহ্নবী বলিল, আগে সে কোনো চিঠি লেখে নাই। এই প্রথম চিঠি।

মা বলিলেন,—নিশ্চয় প্রশ্রয় দেছো, না হলে তার সাহস হয় কখনো তোমাকে চিঠি লিখে ভালোবাসা জানাবার?

জাহ্নবী বলিল, সিনেমায় একদিন দেখা হইয়াছিল···জাহ্নবী জানিত না ও সিনেমায় গিয়াছে! হঠাৎ দেখা। বলিল, নাম নিরঞ্জন··· সামনের মেশে থাকে···বাঁশী বাজায়। তখন মনে পড়িল, তাই বটে! তার পর চিঠি লিখিয়াছে···

মা বলিলেন,—ঐ চিঠি?

জাহ্নবী বলিব—হ্যাঁ।

মা সাবধান করিয়া দিলেন,—খবর্দার জাহ্নবী, এর জবাব দেবে না। কোন্ বংশের মেয়ে তুমি, তা ভুলে যেয়ো না। নাটকে ও-সব যা পড়ো, সত্যি-সত্যি তা কেউ করে না। করা চলে না! অনেক অসুবিধা··· অনেক গোলমাল··· সত্যিকারের জগতে আত্মীয়-বন্ধু আছে, সংসার আছে··· নাটক-নভেলে ও সব বালাই নেই! যা খুশী লিখে গেলেই হলো।

এমনি পাঁচ কথা আলোচনার পর জাহ্নবীর কি মনে হইল··· অসমাপ্ত চিঠিখানা আনিয়া মায়ের সামনে কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

মা আশ্চর্য্য হইলেন···খুশীও হইলেন। বলিলেন—আমার গা ছুঁয়ে বল্ জাহ্নবী, কখনো আর ওকে চিঠি লিখবি না?

নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে অবিচল কণ্ঠে জাহ্নবী বলিল,—না।

—ও বাঁশী বাজালে ও-ঘরে খড়খড়ির ধারে কখখনো গিয়ে আর বসবি

আদিত্য বলিল—না, না...কোনো দরকার হবে না।

জাহ্নবী বলিল—তা হয় না। দয়া করে হাসপাতালে চলুন। চোট লেগেছে, দেখছি···চিকিৎসা দরকার।

আদিত্য তবু বলিল—আজ্ঞে না, আমার এখন হাসপাতালে গেলে চলবে না...অনেক কাজ আছে...জরুরি কাজ···মরণ-বাঁচন···আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সে কাজের উপর।

জাহ্নবী বলিল,—কি কাজ···কোথায় কাজ, বলুন···গাড়ীতে করে' আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো!

ভিড়ে বহু শিক্ষিত মানুষের মনও আদিম বর্ব্বরতায় ভরিয়া ওঠে! এখানকার এ ভিড়েও সে-বিধির ব্যতিক্রম ঘটিল না। তরুণী মোটর-বিহারিণী···তার এমন সপ্রতিভ ভঙ্গী! দু'-চারজন তরুণ লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না···গাহিয়া উঠিল।

ঐ আঁখিরে!

ফিরে ফিরে চেয়োনা চেয়োনা, ফিরে যাও,

কি আর রেখেছো বাকিরে!

সে-সব বর্ব্বরতায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া জাহ্নবী ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়া আদিত্যের হাত ধরিল, ধরিয়া বলিল—আপনাকে এ-অবস্থায় রেখে আমার যাওয়া হতে পারে না···এতখানি অমানুষ আমি নই! আসুন আপনি—আমি কোনো কথা শুনবো না!

এবং এ-কথা বলিয়া রাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গীতে জনতার ইতর উক্তিগুলাকে দু'পায়ে মাড়াইয়া সে আদিত্যকে গাড়ীতে তুলিয়া নিজে গাড়ীতে উঠিয়া তার পাশে বসিল। ড্রাইভারকে বলিল—ঘর চলো···

পথের পুলিশ আসিয়া ড্রাইভারকে কহিল,—ঠাহ্‌রো…

পুলিশকে ড্রাইভারের নাম আর লাইসেন্স-নম্বর দিয়া জাহ্নবী আবার বলিল ড্রাইভারকে—চালাও…

ইতর জনতার মধ্য হইতে একটা মিশ্র উচ্চ কলরব জাগিল। সে-কলরবে জাহ্নবী দৃক্‌পাত করিল না!

গাড়ী গিয়া দাঁড়াইল একেবারে ভবানীপুরে চিন্তাহরণ রায়ের বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায়।

এমনি করিয়া পরিচয়ের সূত্রপাত!

তার পর সাহিত্যালোচনা; এবং এ বাড়ীতে যাতায়াত করিতে হইলে জামা-কাপড়ে সৌখীন পারিপাট্যের প্রয়োজন, সেদিকে আদিত্যের আলস্য রহিল না। গল্প-উপন্যাস লিখিতে লাগিল সবেগে—সে-সবের মারফৎ যে টাকা-পয়সা পায়, সে টাকা-পয়সার বিনিময়ে ধোপদোস্ত ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি প্রভৃতি সংগ্রহে অভাব ঘটে না! কিন্তু…

এদিককার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া আর পাঁচ দিকে টান পড়িল। মেশের ঘরের চার্জ্জ বাকী, কিস্তিবন্দী-রীতিতে দামী যে সব বই কিনিত সে-সবের কিস্তি-খেলাপ…এমনি উপসর্গ উৎপাতের জ্বালায় মনের আরাম কোনো দিন ষোলকলায় পূর্ণ হইতে পারে না!

জাহ্নবী ঘরে বসিয়া এতকাল গল্প-উপন্যাস পড়িত। সে সব গল্প-উপন্যাস যারা লেখে, স্থূল শরীরে তেমন লেখককে কখনো দেখে নাই। কাজেই মোটরের ধাক্কায় আদিত্যর উপর তার প্রথম দিনের

সেই মমতা-অনুকম্পা আজ গল্প-উপন্যাসের পল্লবিত কল্পনা-মার্গে ভর করিয়া অনুরাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! মা গিরিবালা দেখিলেন; এবং মেশের বাসার সেই নিরঞ্জনকে স্মরণ করিয়া তিনি আবার উদ্যোগী হইলেন বড় ঘরের এক পাত্র ধরিয়া তার সঙ্গে জাহ্নবীর বিবাহ দিতে।

শুনিয়া মেয়ে বলিয়া উঠিল,—না!

মা বলিলেন,—অনাসৃষ্টি কথা! বিয়ে করবি না, এ আবার নাকি একটা কথা! যখন মেয়ে হয়ে জন্মেছিস···তাও আবার বাঙালীর ঘরে!

উদাস নেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া জাহ্নবী বলিল—বিয়ে করবো না কখনো, এমন কথা আমি বলিনি!

বিস্ময়ে মায়ের হু'চোখ বিস্ফারিত হইল। অজানা-আশঙ্কায় বুক-খানা একবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! রুদ্ধ নিশ্বাসে মা বলিলেন—তবে?

জাহ্নবী বলিল—বিয়ে যদি করি তো ঐ আদিত্য বাবুকে করবো; আর কাকেও নয়।

মা নির্ব্বাক স্তম্ভিত! জাহ্নবী এ কথার পর সেখানে আর মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না। বয়স আরো বাড়িয়াছে···জ্ঞান-বুদ্ধি অনেক-বেশী বিকশিত! কাজেই এ কথা লইয়া বাদানুবাদে তার রুচি নাই।

গিরিবালা গিয়া চিন্তাহরণের কাছে কথাটা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন। চিন্তাহরণ প্রথমে চিন্তিত হইলেন, তার পর পুরুষোচিত আক্রোশ-ভরে বলিলেন,—পাগল! কাজ-কর্ম্ম করে না···মেশে পড়ে বাঙলা বই লেখে...যাকে বলে, ভ্যাগাবণ্ড! তার সঙ্গে আমি দেবো আমার মেয়ের বিয়ে? পাগল হইনি আমি!

গিরিবালা বলিলেন—বই লিখে ছেলেটির নাম হয়েছে, শুনি!

চিন্তাহরণ বলিলেন,—ছাই ! ও নামের তো ভারী দাম। ভিক্ষা-বৃত্তি ! লোকের বদি খেয়াল হলো, দু'টাকা দিয়ে বই কিনলো। না হলে ? হুঁঃ···নাটক-নভেল জীবনে নেসেসিটি নয় ! ওর কোন মার্কেট-ভ্যালু নেই !

মেয়ের মনের পরিচয় মা জানেন, তাই মা বলিলেন—টাকার কথা বলছো তো ? তা তোমার নিজের এত টাকা রয়েছে···এক মেয়ে···

চিন্তাহরণ বলিলেন,—থাকা টাকা পাখা মেলে উড়তে কতক্ষণ ? তা নয় ! আমি অনেক ভেবে দেখেছি। আমি চাই পাত্রের বাপের টাকা না থাকুক, পাত্রের বিষয়-বুদ্ধি থাকবে। মানে কাজের দাম সে বুঝবে, টাকাব দাম বুঝবে। আমার পরে আমার এ কারবার বুঝে সে চালাতে পারে যেন !

গিরিবালা গিয়া স্নেহ-ভরে মেয়ের সঙ্গে অনেক আলাপ করিলেন।

মেয়ে বলিল,—আমার এক কথা···এ কথা না শোনো, বিয়ে দিয়ো না। আমার কোনো দুঃখ হবে না তার জন্য।

দেশে যে-কাল দেখা দিয়াছে, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় না জানিলেও পাঁচজনের মুখের কথায় গিরিবালা তাহা শুনিয়াছেন ! নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি গিয়া আবার চিন্তাহরণকে ধরিলেন।

চিন্তাহরণ কি যে বুঝিলেন, মেয়েকে ডাকিয়া সুস্পষ্ট প্রশ্নোত্তরে সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিলেন। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে···শাস্ত্রের কথা ! পুত্রে আর কন্যায় এ যুগে প্রভেদ নাই। তার উপর কন্যা জাহ্নবীর ষোড়শ বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে সাত বৎসর পূর্ব্বে ! অতএব···

মেয়েকে তিনি কহিলেন—ছেলের পুরো নাম ?

মেয়ে বলিল—আদিত্য চাটুয্যে।

চিন্তাহরণ বলিলেন—বই লেখে ?

—হ্যাঁ।

—গল্প-উপন্যাস ?

—হ্যাঁ।

—সে-সব গল্প-উপন্যাস ছাপা হয়েছে ?

জাহ্নবী বলিল—হ্যা, হয়েছে। এখনো ছাপা হচ্ছে।

চিন্তাহরণ চিন্তামগ্ন হইলেন। মনে পড়িল ছেলেবেলাকার কথা… তখন বাঙলা সাহিত্যের একটু-আধটু খবর রাখিতেন। তাই বঙ্কিম চাটুয্যে নামটা মনে ভাসিয়া উঠিল। বলিলেন—তোমাদের বঙ্কিম চাটুয্যেও একজন মস্ত লেখক ছিলেন না ?

জাহ্নবী বলিল—ছিলেন। সবাই বলেন, তিনি সাহিত্যসম্রাট।

চিন্তাহরণ বলিলেন—এ ছেলেটিও চাটুয্যে…বললে না ?

—হ্যাঁ।

—এ-ও চাটুয্যে তাহলে সেই বঙ্কিম চাটুয্যের কেউ হয় না কি ? নাতিটাতি ? কিম্বা জ্ঞাতি ?

জাহ্নবী বলিল—না। বঙ্কিম বাবুর কেউ হন না।

চিন্তাহরণের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। তিনি বলিলেন,—তবে ?

ছোট্ট প্রশ্ন ! প্রশ্নটা নিক্ষেপ করিয়াই তিনি চাহিলেন মেয়ের পানে। মেয়ে প্রশ্নটা ঠিক বুঝিল না…কাজেই উত্তর না দিয়া নির্ব্বাক্ দাঁড়াইয়া রহিল।

চিন্তাহরণ বলিলেন—আমি ভেবেছিলুম চাটুয্যে যখন, তখন বঙ্কিম চাটুয্যের নাতি-টাতি হবে হয়তো! তা যদি হয়, তাহলে এ-ও সম্রাট না হোক, সাহিত্যের সদাগর-কোটাল-টোটাল হতে পারবে হয়তো একদিন!

চিন্তাহরণের প্রতিবাদ-আপত্তি টিঁকিল না। গিরিবালা জোর তাগিদ দিতে আরম্ভ করিলেন। কখনো অগ্নিতপ্ত বচনে সে-তাগিদ বুলেটের মত দেহে-মনে আসিয়া লাগে! কখনো বা তাগিদ অশ্রুর বন্যায় বহিয়া চিন্তাহরণের ঐরাবত-তুল্য সঙ্কল্পকে ভাসাইয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়! গিরিবালা বলেন—আর কত বয়স পর্য্যন্ত মেয়েকে এমনি রাখবে? মেয়ে খুব ভালো, তাই···নাহলে একদিন এ বাড়ী থেকে চলে গিয়ে যাকে-তাকে যদি বিয়ে করে বসে?

এত রকমের গোলযোগে চিন্তাহরণের কারবারী-মন দিশাহারা হইয়া ওঠে! লোহার বাজারে মাথা একেবারে লোহার মত ভারী হইয়া থাকে,—মাথা অবলীলায় লক্ষ্মী-সাধনার নব নব মন্ত্র রচিতে পারে না! তখন তিনি মত দিলেন,—বেশ, ঐ ছেলের সঙ্গেই তবে দাও বিয়ে। পুরুত ডেকে দিন ঠিক করে···আমিও কন্যাদায় থেকে মুক্তি পাই।

এ কথা শুনিয়া জাহ্নবী আসিয়া গিরিবালাকে বলিল—তোমাদের তো আবার কোষ্ঠী মেলানো চাই!

গিরিবালা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। জ্যোতিষের উপরে বিশ্বাস আর থিতাইতে পারে নাই···জ্যোতিষীরা কতবার বলিয়াছে,—আর চিন্তা নেই মা...এ বছরের মধ্যে তোমার মেয়ের বিবাহ হবেই। বিবাহের যোগ একেবারে স্পষ্টাক্ষরে লেখা দেখছি···এই যে!

আজ সাত বৎসর ধরিয়া এমন আশ্বাস তিনি অনেক শুনিয়াছেন! আর নয়!

তিনি বলিলেন,—না বাপু, আর কোষ্ঠীতে কাজ নেই…যা করে ভাগ্য!…এই তো এত লোক কোষ্ঠী মিলিয়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিচ্ছে…ঐ বরদা বাবু দিলেন মেয়ের বিয়ে। কাশীর পণ্ডিতরা গুণে বললে, রাজযোটক…মিল হয়েছে। তারপর বছর পেরুলো না…চাঁপার কলির মত মেয়ে হাতের নোয়া সীঁথের সিঁদুর খুইয়ে বাপের কাছে ফিরে এলো! সেই-ইস্তক কোষ্ঠীর উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে!…

তবু…বাঙালী ঘরের বিবাহ! পুরোহিত ডাকাইয়া দিন দেখানো হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে বৈশাখ মাসের ১৩ তারিখ।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি চিন্তাহরণের কাজ পড়িল দার্জ্জিলিঙে। কাজের সঙ্গে দাৰ্জ্জিলিঙে হাওয়া বদলানো…গিরিবালা বলিলেন—আমরাও যাবো তোমার সঙ্গে।

গিরিবালা ও জাহ্নবীকে লইয়া চিন্তাহরণ দার্জ্জিলিঙে গেলেন।

চৈত্র মাস। সামনে নব বর্ষের আয়োজন লইয়া মাসিক-পত্রের বাজারে নানা রকমের অভিসন্ধি চলিয়াছে…আদিত্যর অবসর নাই। দু'খানা মাসিকপত্র চাহিয়াছে তার লেখা উপন্যাস। বৈশাখ হইতে তারা উপন্যাস ছাপিতে সুরু করিবে! তার উপর আরো তিনখানা মাসিক বলিয়াছে, গল্প চাই…

আদিত্যর মেইল্-ডে!

উপন্যাস দু'খানা সে শেষ করিয়াছে…দু'টো গল্পও শেষ…পত্রিকা-গুলার অফিসে গিয়া লেখা দিয়া চেক্ লইয়া আসিয়াছে…উপন্যাস দু'খানার জন্য দু'শো টাকা করিয়া চারশো টাকার চেক—গল্প দু'টির জন্য নগদ চল্লিশ টাকা।

বাসায় আসিয়া দেখে, চিঠি আসিয়াছে। ডাকে-আসা চিঠি।

খামের উপর লেখা নাম-ঠিকানা…মন মাতিয়া উঠিল! জাহ্নবীর লেখা!

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িল।

জাহ্নবী লিখিয়াছে

আদিত্য বাবু

এখনো কাজ চুকিল না? একবার যদি এখানে আসিতে পারিতেন! এখানে কি আনন্দে আছি, আপনার মতো লেখার শক্তি থাকিলে লিখিয়া জানাইতাম।

দিন বেশ কাটিতেছিল। একজনের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। তাঁর নাম মুকুল বাবু। ভদ্রলোক ব্যারিষ্টারী করেন। তিনি প্রায় আসতেন। তাঁর দুই বোন আসতো সঙ্গে। খেলা হতো, বেড়াতে যেতুম—ভারী আমোদে দিন কাটছিল। তাঁরা কালিম্পঙ গেছেন। একলা দিন আর কাটতে চায় না! এ সময়ে যদি আসতে পারতেন, চমৎকার হতো!

একবার আসুন না। এখানে লেখবার জন্য অনেক মেটিরিয়েল্ পাবেন।

আসবেন—আসবেন—আসবেন।

জাহ্নবী

ভবিষ্যৎ

চিঠি পড়িয়া আদিত্যর চোখের সামনে আলো যেন নিবিয়া গেল! চেক পাইয়া অত যে আনন্দ···ভাবিয়া রাখিয়াছে, চেক ভাঙাইয়া সে-টাকায় জাহ্নবীর জন্য তার পছন্দসই উপহার কিনিবে! দুশ্চিন্তার পাথরে সে-আনন্দ চাপা পড়িল!

মুকুল! ব্যারিষ্টার! চমৎকার লোক! তার সঙ্গে বেশ আনন্দে দিন কাটিতেছিল···

মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া উঠিল! আদিত্য বিছানায় বসিয়া পড়িল··· অবসন্ন মূর্চ্ছিতের মতো!

তিন

পাশের কোন্ বাড়ীতে রেডিয়োয় জাগিল গানের লহর···রবীন্দ্র-নাথের গান··

আয়রে ছুটে, টানতে হবে রসি
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি ?
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই করে তুই নেরে কোনোমতে !

গান শুনিয়া আদিত্য উঠিয়া বসিল। মনের মধ্যে যে-অন্ধকার জমিয়াছিল, সে-অন্ধকারে একটু যেন আলোর রেখা ফুটিল !

গানের কথা যেন তাকে ইঙ্গিত করিয়াই বলিতেছে, ঘরের কোণে কেন ? ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া···

মুকুল ব্যারিষ্টার সেখানে যদি জাহ্নবীর সামনে ভিড় জমাইয়া তোলে, আদিত্যর উচিত, সে-ভিড়ের মধ্যে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়া !···

হঠাৎ চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া আবার রেডিয়োর ঐ গান—

রক্তে তোমার দুলছে না কি প্রাণ?
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে?

আদিত্যের মাথার মধ্যে রক্ত নাচিয়া উঠিল। প্রেরণার কি বাণী ও গানে! 'আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে?' নিজের জীবনের পৃষ্ঠাগুলার পানে আদিত্য চাহিয়া দেখিল—যে পৃষ্ঠাগুলা শেষ হইয়া গিয়াছে! সে ক'পৃষ্ঠায় শুধু দ্বিধা ভয় সংশয়…শুধু নৈরাশ্য আর ব্যথা! ভবিষ্যতের পৃষ্ঠাগুলা…আলোয় যেন আলো হইয়া আছে! ভাবিল, অতীতের পানে চাহিয়া থাকে তারা, যাদের দেহে-মনে প্রাণের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে…যারা মরিয়াছে! আদিত্য মরে নাই! তার দেহে-মনে প্রাণের বন্যাবেগ…ভবিষ্যতেই তার লক্ষ্য।

নিশ্বাস ফেলিয়া আদিত্য উঠিল।…পাশের ঘরে থাকেন ম্যানেজার উমেশ বাবু—বয়স পঁয়তাল্লিশের কোঠায় উঠিয়াছে। মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন। সাহিত্যের ধার আগে ধারিতেন না; কিন্তু আজ সাত-আট মাস হইল দ্বিতীয়-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই একুশ বৎসর বয়সের দ্বিতীয়-পক্ষ মনোরমার মনোরঞ্জনের জন্য বাঙলা সাহিত্যের খবরদারীতে তাঁকে নামিতে হইয়াছে। এবং এ-কাজে আদিত্য তাঁর সহায়। দ্বিতীয়-পক্ষ আদিত্যের লেখার ভয়ানক সুখ্যাতি করে। বলে, অত বড় লেখকের সঙ্গে থাকো, একটু-আধটু লেখবার চেষ্টা করো না

কেন? বলে, তাঁকে একবার নিমন্ত্রণ করে আনো না আমাদের এ পাড়াগাঁয়ে।...

মনোরমা গল্প লিখিতেও সুরু করিয়াছে।...উমেশ বাবুকে সে গল্প আনিয়া আদিত্যকে দেখাইতে হয়। দেখিয়া আদিত্য কাটকুট করিয়া দেয়। আদিত্যর উপর মনোরমার ভক্তি-শ্রদ্ধার সীমা নাই! কাজেই আদিত্যকে উমেশ বাবু খাতির করেন। তবে দেশের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে মন কেমন ভয়ে কাঁপিয়া ওঠে। মনে হয়, কি জানি, যদি সুখের নীড়খানি...

কিন্তু সে-কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই!

অফিস হইতে ফিরিয়া উমেশ বাবু বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছেন। পাশের জানলা খোলা। বাহিরে আকাশ দেখা যাইতেছিল। জ্যোৎস্নার আলোয় আলো-করা আকাশ...উমেশ বাবু শুইয়া আকাশের পানে চাহিয়া ছিলেন। মনোরমার কথা ভাবিতেছিলেন। কাল শনিবার... অফিসের ছুটী হইলে আর বাসায় ফিরিবেন না...সোজা যাইবেন ষ্টেশনে ...মনোরমার কতকগুলো ফরমাশ আছে...সেই সব জিনিষপত্র কিনিয়া...

হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গ! আদিত্য আসিয়া ডাকিল,—উমেশ বাবু...

উমেশ বাবু একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন—আদিত্য!

আদিত্য বলিল—হ্যাঁ। আলো জ্বালেন নি যে।

—ও...

আলো জ্বালবো না?

—জ্বালো।

ভবিষ্যৎ

সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া আদিত্য আসিয়া বসিল উমেশ বাবুর তক্তাপোষের প্রান্তে। উমেশ বাবু হাত-পা গুটাইয়া লইলেন।

আদিত্য কহিল—আমার একটু ইয়ে হয়েছে। মানে…

উমেশ বাবু বলিলেন—মাথা ধরেছে না কি?

—না মাথা ধরা নয়! মানে, নেমন্তন্ন এসেছে দার্জ্জিলিং থেকে। জানেন তো, দার্জ্জিলিংয়ে…

উমেশ বাবু বিবাহের কথা জানেন। বলিলেন—হ্যাঁ। তা…

আদিত্য বলিল—টাকাকড়িও কিছু হাতে এসেছে। জানেন তো ও-জিনিষ আমার হাত থেকে কর্পূরের মতো চকিতে উবে যায়! তাই ভাবছি, এ-টাকা থাকতে থাকতে…অর্থাৎ এ-নিমন্ত্রণ যদি না রাখি, তাহলে ভারী লজ্জায় পড়তে হবে।

যৌবন-কালে উমেশ বাবু এ সব সেন্টিমেন্টের ধার ধারেন নাই! প্রথম যখন বিবাহ হইয়াছিল, বয়স ছিল তরুণ। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক সম্বন্ধে বদ্ধ-চলিত যে সব ধারণা সেকালে বর্ত্তমান ছিল, সেই ধারণার বশেই যেটুকু রোমান্সের রেওয়াজ…অর্থাৎ ছবি-ওয়ালা চিঠির কাগজ, লেডিজ গেঞ্জি, জল-ছবি, উল—এই সব কিনিয়া স্ত্রীকে দিয়া ভাবিতেন চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিতেছেন। স্ত্রীর যে স্বতন্ত্র একটা মন আছে এবং সে-মনকে সাধনায় লাভ করিতে হয়,…অথবা ঐ জ্যোৎস্না-রাত্রি, ফুল, সিনেমা…এ-সবের কল্পনাও মনে উদয় হইত না! এখন এ-কালের দ্বিতীয়-পক্ষকে লইয়া বুঝিয়াছেন, যৌবনটা কি ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই না কাটিয়া গিয়াছে! চাকরি এবং টাকা-কড়ির দিকেই ছিল ঝোঁক। সহজ-লভ্য বলিয়া স্ত্রীকে মনের দিক দিয়া কখনো অনুশীলন

করেন নাই। এখন বুঝিয়াছেন, স্ত্রী-জাতির রূপ-লাবণ্যের অন্তরালে যে-মনখানি নিহিত, সে-মনের সঙ্গে পৃথিবীর রাজৈশ্বর্য্যের তুলনা হয় না। তাই নভেলিষ্ট-হিসাবে নয়, আদিত্যর উপর তাঁর মমতা একটু বেশী...তার কারণ, তিনি ভাবেন আদিত্যর কল্যাণেই এ-বয়সে তরুণী ভার্য্যার চিত্ত-রহস্য সম্বন্ধে তিনি বহু জ্ঞান লাভ করিবেন! তার ফলে...

আদিত্যর কথায় তাই তিনি বলিলেন—নিমন্ত্রণ কার কাছ থেকে? ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ীর? না, হার ম্যাজেষ্টি স্বয়ং নিমন্ত্রণ করেছেন?

আদিত্য বলিল—জাহ্নবী নিজে নিমন্ত্রণ করেছেন।

উমেশ বাবু বলিলেন—তাহলে ইতস্ততঃ করছো কেন ভাই? আজই তুমি ষ্টার্ট করো...টাকা তো হাতে মজুত।

ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া আদিত্য বলিল,—তা আছে। কিন্তু ঐখানেই ইয়ে হয়েছে।

সোৎসাহে উমেশ বাবু বলিলেন,—আরে, টাকা যখন হাতে ভায়া, তখন আবার ইয়ে কিসের?

আদিত্য বলিল—মানে, সেখানে একটু ষ্টাইলে থাকতে হবে। জুবিলি সানাটোরিয়মে আমি থাকবো না। আমি চাই, গিয়ে একটা হোটেলে থাকবো। এমন হোটেল যে ওরই মধ্যে খরচ একটু শস্তা হবে, অথচ সেখানকার আসবাবপত্রগুলো নেহাৎ বাজে না হয়।

উমেশ বাবু বলিলেন—তা বেশ তো, এর জন্য এত দুশ্চিন্তা কিসের?

আদিত্য বলিল,—আছে দুশ্চিন্তা। জানেন তো সব, উমেশদা। আপনার কাছে আমার লুকোছাপা কিছু নেই! কিস্তিবন্দীতে কতকগুলো বই কিনেছি। এখানে শ্বশুর-বাড়ীতে ইজ্জৎ রাখতে কাপড়-

চোপড়ে বেশ একটু খরচও হচ্ছে। তার উপর এটা-সেটা কিনে উপহার দেওয়া...মাঝে মাঝে সিনেমায় যাওয়া! বোঝেন তো উমেশদা, এ-কালে এ-সব না হলে মেয়েদের কাছে···মানে, বৌদি এখানে নেই, তাই! থাকলে হপ্তায় একদিনও তাঁকে সিনেমায় নিয়ে যেতে হতো!

উমেশ বাবুর মনের মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ দুলিয়া উঠিল। মনোরমা তাকে বলিয়াছে, একবার একটা ছুটীতে তাকে লইয়া কলিকাতায় আনিয়া সিনেমা-থিয়েটার দেখাইবার কথা···

উমেশ বাবু বলিলেন,—নিশ্চয়!···তা···

কথাটা শেষ না করিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনি চাহিলেন আদিত্যর পানে।

আদিত্য বলিল—তার উপর দাজ্জিলিংয়ে ওঁরা নিশ্চয় বেশ ষ্টাইলে বাস করছেন। চিঠিতে লিখেছেন, সব ব্যারিষ্টার বন্ধুরা বাড়ীতে আসা-যাওয়া করছে। তাদের সামনে এমন দরিদ্র লেখকের বেশে গিয়ে দাঁড়ালে তারা যদি হাসে, জাহ্নবী দেবী লজ্জা পেতে পারেন!

গম্ভীর কণ্ঠে উমেশ বাবু বলিলেন—জাতে ব্যারিষ্টার! তাদের বেজায় চাল শুনতে পাই।

আদিত্য বলিল—তাই এতক্ষণ বসে বসে ভাবছিলুম, কি ব্যবস্থা করা যায়! অন্ততঃ একটা বিলিতি স্যুট চাই। মানে, ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করবার জন্য রাখা উচিত নয় কি? তার উপর খরচপত্র আছে। তা···মেসের চার্জ্জ আমার প্রায় তিন মাসের বাকী পড়েছে···তার উপর বাজারে কিছু দেনা! পেয়েছি তো মোটে চারশো চল্লিশ

টাকা। যাবার সময় ট্রেনে না হয় গুপটি মেরে থার্ড ক্লাশে গেলুম। কিন্তু ফেরবার সময় সকলে যদি ষ্টেশনে শী-অফ্ করতে আসেন? থার্ডে বা ইণ্টারে চড়া যাবে না···সেকেণ্ড ক্লাশ টিকিট কিনতে হবে। সে বড় সামান্য খরচ হবে না! তার উপর সাত দিনও যদি থাকি, সাতদিনের হোটেল-খরচ···আমোদ-প্রমোদ,···এ-সবে যার নাম চারশো চল্লিশটি টাকা ফুট-কড়াই হয়ে উড়ে যাবে উমেশদা।

কথা শেষ করিয়া নিরুপায় অসহায়ের ভঙ্গীতে আদিত্য চাহিল উমেশ বাবুর পানে।

উমেশ বাবু চিরদিনই চাকরিই করিতেছেন; লেজার আর করেসপেণ্ডেন্স ঘাঁটিয়া তাঁর দিন কাটে। হাই-লাইফের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। বাঙালী সাহেবদের দু'চারিটা ষ্টাইল, মডার্ন মেয়েদের হাসি-কথার ভঙ্গি মনে ক্বচিৎ-কখনো ঝাপটা মারিয়া সরিয়া গিয়াছে···সে ঝাপটায় তাঁর যেটুকু উপলব্ধি, সে উপলব্ধির উপর নির্ভর করিয়া উমেশ বাবু শুধু বলিলেন,—হুঁ!

তার পর তিনি চুপ করিয়া রহিলেন···অনেকক্ষণ! আদিত্যর প্রশ্ন-ভরা দু'চোখের দৃষ্টি উমেশ বাবুর মুখে নিবদ্ধ, যেন সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া আকুল!

উমেশ বাবুর গম্ভীর মুখে সমাধানের সন্ধান মিলিল না, তখন আদিত্য কথা কহিল। বলিল,—আপনি যদি একটু দয়া করেন ···মানে, মেসের টাকার জন্য তাগিদ না দেন। অর্থাৎ দার্জ্জিলিং গিয়ে আমি প্রণয়-স্বপ্নেই বিভোর থাকবো না উমেশদা—ওখানে বসে বড় একখানা উপন্যাস লিখে ফেলবো···সাতশো আটশো পাতার

উপন্যাস···তিন পার্টে। দার্জ্জিলিংয়ের সোশাল লাইফ নিয়ে। ও জিনিষ আমার কাছে নতুন। ফিরে এসে সে-উপন্যাসের কপি-রাইট যদি বেচতে হয়, বেচবো। বেচে মেসের দেনা সব ক্লীয়ার করে দেবো। বাকী দেনা পরে পরিশোধ করবো! তার কারণ, যেখানে মাথা গুঁজে বাস করছি···আশ্রয়, সে-আশ্রয়কে নির্বিঘ্ন নিরাপদ রাখা সব-আগে কর্ত্তব্য।

উমেশ বাবু চট্ করিয়া এ-কথার জবাব দিতে পারিলেন না। এ কথায় তাঁর মনের মধ্যে নানা কথা জোট্ পাকাইয়া উঠিল! সকলের টাকায় মেসের খরচ চলে···কাহারো টাকা বাকী থাকিলে কত দিকে যে টান্ পড়ে, মেসের ম্যানেজারী করিয়া তিনি তাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে বোঝেন। বাকী-বকেয়ার জন্য কাহাকেও তিনি তাগিদে অব্যাহতি দেন না! শুধু এই আদিত্য···আদিত্য এ-মেসে আছে অনেক দিন। দু'এক মাস সে টাকা দিতে পারে নাই, এমন ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে; বই লেখে বলিয়া সকলে তার দায় কোনো মতে সামলাইয়া লইতেছে··· চিরদিন। উমেশ বাবু ইদানীং নিজের পকেট হইতে তার জন্য কিছু গচ্চাও দিয়াছেন! এ গচ্চা যে দিয়াছেন, শুধু সাহিত্যের খাতিরে নয়, দ্বিতীয়-পক্ষ অলক্ষ্যে আছে আদিত্যের সহায়, তাই। কিন্তু তা বলিয়া দু' তিন মাসের টাকা বাকী···এখনো ক'মাস বাকী পড়ে·· আর পাঁচ জনে কি বলিবে?

আদিত্য বলিল—আপনি দয়া না করলে আমার দার্জ্জিলং যাওয়া হবে না উমেশদা! একটু দয়া করুন...নট ওয়ান্ বাট্ টু ইয়ং হার্টস্···

উমেশ বাবু বলিলেন—এক মাসের কুড়িটা টাকাও দিতে পারবে না আদিত্য? মানে···

আদিত্য বলিল—কুড়ি কেন, চল্লিশ টাকা দিতে পারি···কিন্তু সেখানে কোনো কারণে যদি অভাব ঘটে, বিয়েটাই হয়তো ফেঁশে যাবে! জাহ্নবী দেবীর কথা নয়···বোঝেন তো, আপনার বয়স হয়েছে, সাংসারিক অভিজ্ঞতা প্রচুর···জাহ্নবী দেবীর বাবা হলেন বড়-মানুষ লোক···ওঁদের মনে কি স্নেহ-মায়া আছে, না, বিবেক আছে? ওঁদের মন একেবারে টাকা-পয়সা দিয়ে গাঁথা·· যাকে বলে মেটাল্‌ড্‌! তাছাড়া আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে কি ওঁরা সাধে রাজী হয়েছেন? একটি মাত্র মেয়ে···তার জিদ···যদি একটু ত্রুটি পান···তাহলেই···

কথার শেষাংশ বলা হইল না। আদিত্য উমেশ বাবুর দুটো হাত চাপিয়া ধরিল।

উমেশ বাবুর বুকখানা দুলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—আচ্ছা. উপায় যখন নেই! ··কিন্তু ওখানে বসে ঐ যা বললে, ঐ তিন ভল্যুমের উপন্যাসখানি লিখে ফেলো আদিত্য, না হলে আমি এদিকে সামলাতে পারবো না। বোঝো তো বলতে গেলে আমার দুটি সংসার · তোমার বৌদির জন্যই মাসে কম্‌সে-কম আমার বারো-চৌদ্দ টাকা বাড়্‌তি-খরচ পড়ে।

আদিত্য বলিল—তা আর বুঝি না?...ভালো কথা, এ মাসের 'কনকপ্রভা'য় আমার ভালো একটা গল্প বেরিয়েছে। বৌদির জন্য এক-কপি কনকপ্রভা আমি এনেছি। আপনাকে দি···কালই বাড়ী গিয়ে সেটা বৌদিকে আপনি দিয়ে দেবেন। ভুলবেন না। পড়ে বৌদি খুব এ্যাপ্রিসিয়েট করবেন!

চার

শিলিগুড়িতে নামিয়া আদিত্য কিনিল সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট : শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত থার্ড-ক্লাশে আসিয়াছে।

দার্জ্জিলিং-লাইনের গাড়ীতে সেকেণ্ড-ক্লাশ কামরায় বসিয়া মনে পড়িল অতীত কৈশোরের কথা! কালীঝোরায় তার শৈশব কাটিয়াছে। বাপের ছিল শিলিগুড়িতে কাঠের কারবার। কারবারের দৌলতে অবস্থা ছিল ভালো। তার পর ঘটিল পিতার মৃত্যু। সে মৃত্যুর পর দশ বৎসরের মধ্যে বড় ভাই বিক্রম কি মন্ত্র-বলে যে কারবারটিকে চূর্ণ করিয়া আদিত্যকে ছাঁটিয়া বাহির করিয়া দিয়া বলিল,—নিজের পথ ছাখো···সে যেন স্বপ্ন!

সেদিন হইতে আদিত্য ভাগ্য-গঠনে নামিয়াছে। কোনোমতে কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হয়। টুইশনি করিয়া লেখাপড়া শেখে। আই-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছে, এমন সময় বীণাপাণি হঠাৎ তাকে টানিয়া সাহিত্য-কাননে আনিয়া ফেলিলেন। সে গল্প আর নভেল লিখিতে সুরু করিল; এবং আজ এই সাহিত্যই তার একমাত্র নির্ভর!

ভবিষ্যৎ

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাহাড় ঘুরিয়া ট্রেণ চলিয়াছে। লাইনের দু'দিকে ঘন জঙ্গল...ঐ পাগলাঝোরা...মহানদী...কার্শিয়ং ষ্টেশন···দূরে ঐ দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা, কবরু···জহ্নুর তুঙ্গ শিখর। তার পর আদিত্যর কামনার তীর্থ দার্জ্জিলিঙ!

প্লাটফর্ম্মে নামিবামাত্র হাস্যোজ্জ্বল দুটি চোখের দৃষ্টি। জাহ্নবী আসিয়া বলিল—কাল টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম। ভাগ্যে টেলিগ্রাম করেছিলেন! না হলে...

না হইলে কি? আদিত্য চারিদিকে চাহিয়া দেখিল...জাহ্নবীর বাবা আসিয়াছেন কি না? মা? সঙ্গে সেই মুকুল ব্যারিষ্টার?

আদিত্য বলিল—আপনি একলা এসেছেন?

জাহ্নবী বলিল—কাকে আর সঙ্গে আনবো বলুন? টেলিগ্রাম না করতেন যদি, তাহলে আজ আমাকে এখানে পেতেনও না! কালিম্পঙে চলে যেতুম। নেমন্তন্ন। মুকুল বাবুর কথা লিখেছিলুম না? মুকুল বাবুরা এখন কালিম্পঙে আছেন। তাঁর ছোট বোন সীতার আজ জন্ম-তিথি। তারি নেমন্তন্ন!

মুকুলের নামে আদিত্যর যে-বুক দশ হাত নামিয়া গিয়াছিল, সে-বুক উঁচু হইয়া উঠিল। মৃদু হাস্যে আদিত্য বলিল—আমার সৌভাগ্য!

জাহ্নবী বলিল—আপনার লগেজ?

আদিত্য বলিল—একটা সুটকেশ আর বেডিং...ব্যস্!

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসছেন তো?

আদিত্য বলিল—আসা ঠিক হবে? আপনাদের বিরক্ত করা হবে। আমি একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছি এখানকার হিল-ভিউ হোটেলে... কামরার জন্য। আমার এক বন্ধু দার্জ্জিলিঙে এসে সেই হোটেলে ছিলেন। তাঁরি কাছে শুনে···মানে.···

জাহ্নবী ভ্রূকুটি-ভঙ্গী করিল, বলিল—আমাদের ওখানে তাহলে থাকবেন না।

আদিত্য বলিল—আপনার গেষ্ট হয়ে থাকতে পারি। কিন্তু আপনাদের বাড়ীতে আপনার বাবা হলেন হোষ্ট। তাঁকে...তাঁরা বলেছেন সেখানে থাকবার কথা?

জাহ্নবী বলিল—বাবা-মা জানেন না, আপনি আসছেন। মুকুল বাবুরা চলে যেতে একলাটি আমার ভারী ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল। তাই কি মনে হলো, আপনাকে আসতে লিখলুম। ভাবিনি, আমার কথায় আপনি সত্যি আসবেন!

আদিত্যর মনের মধ্যে রামধনুর সাতটা রঙ একেবারে ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল! নিঃসঙ্গতা-মোচনের জন্য জাহ্নবী তাকে স্মরণ করিয়াছে!

বিমুগ্ধ নয়নে আদিত্য চাহিয়া রহিল জাহ্নবীর পানে।

জাহ্নবী বলিল—আপনার ও-হোটেল কোন্ মহল্লায়?

আদিত্য বলিল—জলাপাহাড়ে।

জাহ্নবী বলিল—ও...আমরা থাকি ক্যালকাটা রোডে। রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্প পড়েছেন তো? সেই যে যে-রাস্তায় নবাবজাদীর সঙ্গে দেখা?

মৃদু হাস্যে আদিত্য বলিল—নিশ্চয় মনে আছে। ক্যালকাটা রোড নামটা তাই থেকে মনে একেবারে গেঁথে আছে।

জাহ্নবী বলিল—চলুন, দুখানা রিক্‌শ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আপনার হোটেলে নেমে আপনার সব গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ে তার পর বাড়ী যাবো।

আদিত্য বলিল—আপনার বাবা-মা সত্যি জানেন না, আমি আসছি ?

—না। আমাদের ওখানে এখনি যদি যেতেন, তাহলে বলতুম, আপনার সঙ্গে ষ্টেশনে হঠাৎ দেখা! অর্থাৎ আমি যেন আপনাকে আসতে লিখিনি! আপনি এমনি এসেছেন !···তা আপনি যখন আমাদের ওখানে যাচ্ছেন না, তখন আর একরকমে ওঁদের সারপ্রাইজ দেবো'খন; সন্ধ্যার আগে আপনি রিক্‌শয় করে আমাদের ওখানে যাবেন। যে-কোনো রিক্‌শওয়ালাকে বললেই আমাদের বাড়ীতে আপনাকে পৌছে দেবে। আপনি গেলে আমিও তখন এমন ভাব দেখাবো যেন আমি জানি না আপনি এসেছেন বা আসছেন! কি বলেন ?

আদিত্য বলিল—কিন্তু আমি খুব ওয়েলকাম গেষ্ট হবো কি ?

ভ্রূভঙ্গী করিয়া জাহ্নবী বলিল—সাহিত্যিক ষ্টাইল বুঝি···আপনার হাতে আমাকে ওঁরা দান করবেন এক মাস পরে, আর আপনাকে ওঁরা ওয়েলকাম্ করবেন না ?

আদিত্য বলিল—তা বটে।

দুজনে প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিয়া দুখানা রিক্‌শ লইল; এবং রিক্‌শ

আসিয়া থামিল হিল-ভিউ হোটেলের সামনে। ম্যানেজার বলিল—আদিত্যর টেলিগ্রাম পাইয়াছে···আদিত্যর জন্য কামরা ঠিক করা আছে।

দুজনে আসিল নির্দ্দিষ্ট কামরায়। ছোট কামরা। সুসজ্জিত। ব্যবস্থা ভালো।

জাহ্নবী বলিল—যান, আপনি স্নানাহার সেরে নিন। দেরী করবেন না। আমি আপনার জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখি। আমিও আর দেরী করবো না। বাড়ীতে কিছু না বলে এসেছি। কখন্ বেরিয়েছি...উঃ! আর বেশী দেরী করলে বাড়ীতে দুশ্চিন্তার সীমা থাকবে না। মা ভাববে, পাহাড় থেকে নিশ্চয় পড়ে গেছি। আর বাবা যা ভাববে···

কথাটা জাহ্নবী শেষ করিল না।

আদিত্য বলিল—বাবা কি ভাববেন?

জাহ্নবী বলিল—সে কথা নাই শুনলেন! যান আপনি বাথ-রুমে···

আদিত্য চলিয়া যাইতেছিল।

জাহ্নবী বলিল—নতুন কি বই বেরুলো, শুনি?

আদিত্য বলিল—এখনো বেরোয় নি। দুখানা নভেল ছাপা সুরু হবে সামনের বোশেখ থেকে। প্রদীপে বেরুবে 'দিগন্ত' আর উদীচীতে বেরুবে 'চক্রবাক'। লিখে শেষ করে দিয়ে এসেছি!

জাহ্নবী শুনিল একাগ্র মনে···তারপর বলিল—নতুন খপর কিছু আছে?···লেখার সম্বন্ধে?

আদিত্য বলিল—না···তবে আমার মনে হয়, কেন জানিনা যে

আমার জীবনে নিশ্চয় ঘটবে···অত্যাশ্চর্য্য রকমের কোনো ঘটনা। আরব্য উপন্যাসে যেমন গল্প পড়ি···তেমনি !

হাসিয়া জাহ্নবী কহিল—শাহাজাদী আসবেন জীবন-পথে ?

আদিত্য বলিল—শাহজাদী-বাদশাজাদী এলে তো দুঃখ ঘুচবে না··· দুঃখ ঘোচাবার জন্য চাই টাকা !

জাহ্নবী চাহিল আদিত্যর পানে···প্রায় এক মিনিট···তারপর বলিল —টাকা-কড়ির জন্য এত দুশ্চিন্তা করেন কেন ?

আদিত্য বলিল—তেমন করে টাকা-পয়সার সাধনা কখনো করিনি··· করতে শিখিনি জাহ্নবী। কিন্তু থাক্ সে কথা···

জাহ্নবী বলিল—ভালো! এখন আর কোন কথা নয়...আপনি আপনি বাথরুমে যান্ দিকিনি।

এ-কথায় আদিত্য গিয়ে বাথরুমে ঢুকিল।···

জাহ্নবী তার স্যুটকেশ খুলিল। সামনেই কাগজের বাক্সে-ভরা বিলাতী স্যুট···বাক্সের ডালায় কলিকাতার বিলাতী দোকানের নাম ছাপা !

কৌতূহল হইল। বাক্সের ডালা খুলিয়া জাহ্নবী স্যুট দেখিল! রেডিমেট স্যুট। দামের টিকিট লাগানো রহিয়াছে। সে টিকিট আদিত্য খুলিয়া ফেলে নাই! জাহ্নবী টিকিট দেখিল···দাম সাতষট্টি টাকা।

দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল!···সাতষট্টি টাকা খরচ করিয়া বসিয়াছে একটা স্যুটের পিছনে!···দার্জ্জিলিং আসিবার জন্য···নিশ্চয়! আদিত্যকে এতদিন সে দেখিতেছে···কখনো তাকে স্যুট পড়িতে দেখে নাই! হঠাৎ এ বিলাতী পোষাকের ভূতে তাকে পাইয়া বসিল কেন ?

মুখ-হাত ধুইয়া আদিত্য ফিরিল…বলিল্—কি হচ্ছে ও ?

জাহ্নবী বলিল—এ বেশে আপনার রুচি হলো কবে থেকে ?

আদিত্যর মনে হইল, চমৎকার সুযোগ…এই পোষাককে কেন্দ্র করিয়া একটা স্মার্ট হিট্‥সে হিটে জাহ্নবীর মনের কথা জানা যাইবে…ঐ মুকুল ব্যারিষ্টারের সম্বন্ধে !

আদিত্য বলিল—তুমি চিঠিতে লিখেছো এখানে তোমার সব রেস্‌পেকেটব্‌ল বন্ধু-বান্ধব আছেন—তাঁদের সামনে পাছে খেলো বলে…

দু' ঠোঁট ফুলাইয়া ভ্রূ বাঁকাইয়া জাহ্নবী বলিল—আপনার যে ক্ষমতা আছে, তার দাম এ বিলাতী পোষাকের চেয়ে বেশী বলে আপনি মনে করেন না ?

আদিত্য খুশী হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল বাংলা দেশে লেখকদের প্রতিভার মর্য্যাদার কথা ! লেখককে কে-বা মানে এ দেশে ! সে বলিল—লেখার জন্য আমার মনে এতটুকু সাহস বা শক্তি পাই না।

জাহ্নবী বলিল,—তার মানে ?

আদিত্য বলিল—আমার লেখা বই ক'জনই বা পড়ে ! তাছাড়া বই বিক্রী হয় ঢাকের বাদ্যিতে ! আমার বই যতই ভালো হোক, ঢাক বাজিয়ে আমার দলের লোক যদি তার কথা প্রচার না করে, বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকা সে লেখা ভাল লাগলেও কখনো বলবে না, আমি ভাল লিখি। দেখছি তো…বাংলা দেশে সাহিত্যের দাম-কষাকষি করে পাঁচ-সাতটা বাজনদারে ! এদের দল আছে।

নিজের দলকে প্রচার করা হলো এদের পেশা। যারা দলের নয় তাদের করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য!—

হাসিয়া জাহ্নবী বলিল—আপনি ভাবেন ঐ ঢাকের বাজনাই জয়ী হবে?

আদিত্য বলিল—তার মানে?

জাহ্নবী বলিল,—আমার মনে হয়, যে লেখা সত্যি ভালো, সে-লেখার প্রচারের জন্য ঢাক-ঢোলের দরকার হয় না। ঢাক-ঢোলে যে-লেখার প্রচার হয়—গ্রামে তো দেখি, গাজনের ঢাক-ঢোল বন্ধ হলে চড়ক-তলা যেমন খাঁ-খাঁ করতে থাকে—তেমনি দলের লোকের সমালোচনার ঢোল থামার সঙ্গে সঙ্গে সে সব লেখার পানে কেউ ফিরেও তাকায় না।···কিন্তু না···এ সব আলোচনার সময় পাওয়া যাবে পরে অনেক। দেড়টা বেজে গেছে···আপনি খেয়ে নিন। রঘুকে ডাকুন···আমি আসি। ছটার মধ্যে আসবেন···কিন্তু আমাদের ওখানে। আসা চাই।···বুঝলেন?

কথাটা বলিয়াই জাহ্নবী যাইতে উদ্যত হইল···আদিত্য ডাকিল—জাহ্নবী···

জাহ্নবী ফিরিল। মৃদু হাস্যে বলিল—পেছু ডাকলেন?

আদিত্য বলিল—একটা কথা···

—বলুন···

আদিত্য বলিল—তোমার বিবাহের সম্বন্ধে তোমার বাবার আর মার মত বদলাবে না?

জাহ্নবী বলিল—আপনার সম্বন্ধে? বোধ হয়, না।···বাবা-মা

বিয়ের সম্বন্ধে কোনো কথা তোলে না।...বুঝেছে...তোলা হোপলেশ !

আদিত্য বলিল—কিন্তু ওঁদের মনের ইচ্ছা, তোমাদের মত ধনীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দ্যান্।

জাহ্নবী বলিল—ওঁদের সে ইচ্ছা পূরণ হতে পারতো—যদি দশ বছর আগে আমার বিয়ে দিতেন !...কিন্তু এ সব আলোচনা তো অনেকবার হয়েছে! এখনো আপনার ধৈর্য্য আছে ?...কিন্তু না, কথায় কথা বাড়ে। আমি আর একটি কথাও কবো না...ডাকলেও আব ফিরবো না।...চললুম। সন্ধ্যার সময় দেখা হবে। আসবেন আমাদের বাড়ীতে। ছটার মধ্যে। আর মনে আছে তো...আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি...আমি জানিও না যে আপনি দার্জ্জিলিংয়ে এসেছেন...কেমন ?

মৃদু হাস্যে আদিত্য বলিল,—এ-কথা মনে থাকবে।

জাহ্নবী চলিয়া গেল।

আদিত্য নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। মন আনন্দে পরিপূর্ণ। গল্পে-উপন্যাসে প্রেমের কথা অনেক লিখিয়াছে...দু-চার জন সম্পাদক সে-লেখায় সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন,...ভারী স্মার্ট আর ডেলিকেট টচ্ বলিয়া !...কিন্তু এমন? সত্যকার এই প্রেম...জাহ্নবীর এ ভালোবাসা...মনে হইল, কলমের লেখায় নারী-চরিত্র আঁকিতেছে...কিন্তু নারী-চরিত্রে এমন কমনীয় রহস্য, এমন মাধুরী...এ তার কল্পনাতেও কখনো উদয় হয় নাই !

পাঁচ

সাড়ে পাঁচটার সময় আদিত্য আসিয়া হাজির হইল ক্যালকাটা রোডে চিন্তাহরণের গৃহে।

পরিচ্ছন্ন ছোট বাঙলো। সামনে একটু খোলা জায়গায় বাগান। রকমারি ফুলে বাগান যেন আলো হইয়া আছে!

বাংলোর বারান্দায় একখানা ইজি চেয়ারে বসিয়া গিরিবালা। গিরিবালার মাথার চুল এলানো। মাথায় কাপড় নাই। কাছে একজন দাসী একটা বেতের মোড়ায় বসিয়া গিরিবালার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতেছে।

গিরিবালা যে-ভাবে বসিয়া আছেন, তাহাতে তাঁর সামনে গিয়া না দাঁড়াইলে আদিত্যর উপস্থিতি তিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না!

কাহারো সাড়া নাই! আদিত্য দাঁড়াইয়া চারিদিকে একবার চাহিল। ঘরের খোলা খড়খড়ির দিকেও দৃষ্টি বুলাইল। খড়খড়িতে সার্শি আঁটা। সার্শির কাঁচের ওদিকে শুধু নীল রঙের পর্দাটুকু দেখা গেল! ভাবিয়াছিল, ওখানে হয়তো দেখিবে জাহ্নবীর দুটি চোখ! নাই!

গিরিবালার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আদিত্য দূরে দাঁড়াইয়াই খুক্-খুক্ করিয়া কাশিল।

কাশিতে বিদ্যুতের প্রবাহ ছিল না! কিন্তু সে-শব্দে গিরিবালা ধড়মড়িয়া ইজিচেয়ার হইতে দেহ-ভার তুলিয়া শশব্যস্তে পর্দা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন…আঁচলের প্রান্তটুকু মেঝের উপর দিয়া লুটাইয়া চলিল।

ঘরে ঢুকিয়াই দাসীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—কে ভদ্দরলোক এসেছেন রে। বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা বগলা।

দাসীর নাম বগলা। গিরিবালার কথায় বগলা আগন্তুকের পানে চাহিল। চাহিবামাত্র চিনিল। এবং চিনিবামাত্র তার মুখে-চোখে হাসির বিদ্যুৎ ফুটিল। আদিত্যর অভ্যর্থনা না করিয়া সেও গিয়া ঘরে ঢুকিল…ঢুকিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—ভদ্দরনোক নয় গো মা…কলকাতার আদি বাবু।

আদিত্য কথাটা শুনিল। শুনিয়া সে সাগ্রহে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরক্ষণেই মেঝের আঁচল টানিয়া মাথায় তুলিয়া গিরিবালা আবার বাহিরে আসিলেন। আসিয়া আদিত্যকে দেখিলেন। বলিলেন—ও বাবা, তুমি এসেছো! তা এসো, এসো…

আদিত্য হাসি-মুখে বারান্দায় উঠিয়া গিরিবালার পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

গিরিবালা আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর বলিলেন—ঘরে এসো বাবা।

বারান্দায় দু'চারখানা বেতের চেয়ার ছিল। আদিত্য বলিল—

এই বারান্দাতেই বসি। চারিধার দেখা যাচ্ছে। চমৎকার! পথে কত রকমের লোক চলেছে।

গিরিবালা বলিলেন—হ্যাঁ। আজ হাট-বার কিনা! রবিবারে এখানে হাট বসে। হাট থেকে সব ফিরছে। তা, ভালো আছো বাবা?

আদিত্য বলিল—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

গিরিবালা চাহিলেন দাসী বগলার পানে। বগলা পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। তাকে উদ্দেশ করিয়া গিরিবালা বলিলেন—তোর দিদিমণিকে খপর দে। বল্, আদিত্য এসেছে।

বগলাকে যাইতে হইল না। সজ্জিত বেশে জাহ্নবী নিমেষে আসিয়া বারান্দায় উদয় হইল।

আদিত্যকে দেখিয়া জাহ্নবী বলিল—এ কি আপনি হঠাৎ কোথা থেকে?

আদিত্য বলিল—ছুটী ছিল···বেড়াতে এলুম।

গিরিবালা বলিলেন—এখন তো ট্রেণ নেই···লেট্ হয়েছিল বুঝি?

আদিত্য বলিল—না। আমি ঠিক সময়েই এসেছি।

গিরিবালা বলিলেন—এতক্ষণ পথে পথে ঘুরছিলে না কি বাড়ীর সন্ধানে?···এ বাড়ীর ঠিকানা···

জাহ্নবীর চোখে হাসির ক্ষীণ বিদ্যুৎশিখা···মুখ গম্ভীর—আদিত্য তাহা দেখিল। ইঙ্গিত বুঝিল। বুঝিয়া আদিত্য বলিল—পথে ঘুরিনি। এখানে এসে আমি জলাপাহাড়ে হিল ভিউ হোটেলে আছি, সেই হোটেলে উঠেছি।

গিরিবালা বলিলেন—আমার এখানে জায়গা থাকতে পয়সা খরচ করে আবার হোটেলে ওঠা কেন বাবা? এই সেদিন আমার এক বোন্‌পো এখানে এসে পাঁচ দিন থেকে গেল। কখনো সে দার্জ্জিলিং ভাখেনি···বললে, তোমরা আছো মাসিমা···ট্রেণ ভাড়া খরচ করে দার্জ্জিলিংটা দেখতে এলুম।...কলকাতাতেই সে চাকরি করে···এবারে ছুটী পাবে না। ছুটীর সময়েও তাকে অফিস করতে হবে। সাহেব তাই বলেছিল···ছুটীর আগে সাত দিনের ছুটী দিচ্ছি, ঘুরে এসো বিশ্বনাথ···যদি চাও। ··সে ছিল এখানে, তার জন্য আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি।

ভিতরের ঘর হইতে চিন্তাহরণের সাড়া জাগিল। চিন্তাহরণ কহিলেন —কার সঙ্গে কথা কইছো তোমরা?

নেপথ্যান্তরালের সে কণ্ঠ উদ্দেশ করিয়া গিরিবালা বলিলেন— আদিত্য এসেছে গো।

—আদিত্য! বলিয়া চিন্তাহরণ বারান্দায় আসিলেন। তাঁর পরণে পট্টুর ব্রীচেশ, গায়ে ভারী একটা ওভারকোট চাপানো, মাথায় ক্যাপ।···

চিন্তাহরণকে এ-বেশে আদিত্য পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই! সে জানিত পয়সার পাহাড়ে উঠিয়া বসিলেও চিন্তাহরণ বিলাতী সুটের মায়ায় উদ্‌ভ্রান্ত হইবার লোক নন্‌!

ভূমিষ্ঠ হইয়া চিন্তাহরণকে সে প্রণাম করিল।

চিন্তাহরণ কহিলেন—বেড়াতে বেরুচ্ছিলুম জাহ্নবীর তাড়ায়। আজ একটু অবসর আছে···ও বলে, দার্জ্জিলিংয়ে এসেও পয়সার মধ্যে মুখ জুবড়ে থাকবে···ঘুরে দেশটা একবার দেখবে না বাবা? কাজেই

বললুম, চ'। কোথায় এখানে আছে ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্‌…ও সেই ফল্‌স্‌ দেখাতে নিয়ে যাবে।

হাসিয়া জাহ্নবী চাহিল আদিত্যর পানে, বলিল—জানেন আদিত্য বাবু, এখানে কি আছে আর কি নেই…তার মধ্যে বাবা জানেন এখানে আছে শুধু আয়রণ-সাইড ওয়ার্কসের বড় সাহেব ষ্টুয়ার্ট, গভর্ণমেণ্ট এঞ্জিনীয়ার প্রাইস আর কোথায় নতুন ব্রিজ তৈরী হচ্ছে, সেই ব্রিজের পাহাড় আর খাদ্‌!…এতদিন এখানে এসেছেন, কোথাও একদিন বাবাকে নিয়ে যেতে পারিনি!

চিন্তাহরণ হাসিলেন; কহিলেন—লোহা-লক্কড় ছাড়া আর কিছুর পানে চাইতে পারিনি রে। ভাবি, আর কিছুই যখন জীবনে দেখা হলো না…যে কটা দিন আছি…মিছে আর সে-সবের পানে চেয়ে কি-বা লাভ হবে! তার চেয়ে যা করতে এসেছি…তাই করে চলে যাই!

হাসিয়া জাহ্নবী বলিল—জন্ম নেছো বলতে চাও, শুধু লোহা ঘাঁটবার জন্য?

হাসিয়া চিন্তাহরণ বলিলেন—তা নয় তো আর কি, বলো?

জাহ্নবী বলিল—না বাবা, এ-কথা শুনলে আমার ভারী রাগ হয়। এমন সুন্দর পৃথিবী…সে পৃথিবীতে লোকজন, পাহাড় পর্ব্বত, নদী-ঝর্ণা…

বাধা দিয়া চিন্তাহরণ বলিলেন—আমি শুধু এই লোহা আঁকড়ে পড়ে আছি বলে' তোরা অবসর পেয়েছিস পৃথিবীকে ভালো করে দেখবার…তা বুজিস?

গিরিবালা বলিলেন—যত তোমার অনাসৃষ্টি কথা।…যে-রাঁধুনি

রাঁধে, সে বুঝি চুল বাঁধে না?...ব্যবসা সবাই করছে...তা বলে তোমার মতন কেউ নয় যে কোনো দিকে চাইবে না...পণ করে বসেছো!

চিন্তাহরণ হাসিলেন, বলিলেন—যাক্...আজ তো তাই যাচ্ছিলুম তোমার মেয়ের সঙ্গে ফল্‌স্ দেখতে। তাও বলবো কিন্তু, যদি বলতিস্ পাহাড়ী ঝর্ণা দেখবে চলো...তাহলে মনটা খুশী হতো! মনে হতো, বিধাতার তৈরী কোনো অপূর্ব্ব জিনিষ দেখবো গিয়ে! কিন্তু যেই বলেছিস, ভিক্টোরিয়া ফল্‌স...অমনি মনের উৎসাহ কমে গেছে! এ নাম শুনলে মনে হয়, মানুষ বুঝি ভগবানের উপর কোনোরকম কারচুপি করেছে...সেই কারচুপি প্রকাশ করছে এই মডার্ণ নাম দিয়ে!...তা যাক...আদিত্য এখানে কোথায় এসেছিলে? কোনো কাজ ছিল?

সলজ্জ হাস্যে আদিত্য বলিল—আজ্ঞে না, কাজ নয়। ছুটি হলো, তাই একটু বেড়াতে এসেছি!

—কার কাছে এখানে এসেছো? কোথায় উঠেছো?

—কারো বাড়ীতে নয়। এসে উঠেছি এখানকার হিল্ ভিউ হোটেলে।

চিন্তাহরণ বলিলেন—বেড়াতে এসেছো! তাও কারো বাড়ীতে নয়। তার উপর হোটেল! এই শুনতে পাই, লিখে কোনো মতে পয়সা-কড়ি রোজগার করছো। লিখে কিবা রোজগার হয়! হুঁঃ! সে টাকা খরচ করতে মমতা হয় না? হোটেলে কতদিন থাকবে? দৈনিক খরচের মাত্রা কি-রকম, শুনি?

আদিত্য এ-কথার জবাব দিল না। লজ্জায় যেন নুইয়া পড়িল! গিরিবালা বলিলেন—তোমার এ অন্যায় কথা। ওর এই বয়স...মনে কত

সাধ···কত ইচ্ছে! পয়সা রোজগার করতে হবে বলে' এক দণ্ড হাঁফ্ ফেলবে না? এখানে এসেছে···দুদিন এখানে থাকলে দেহ-মন তাজা হবে···খাটবার সামর্থ্য বাড়বে, তাই!

চিন্তাহরণ বলিলেন ওটা ভুল কথা! বেড়াতে আসে মানুষ সখের জন্য! দেহ-মনের শক্তি-সামর্থ্য···তার জন্য দার্জ্জিলিংয়ে হাওয়া খাবার দরকার হয় না। কাজ যে করে কাজের মধ্যেই সে উৎসাহ পায়, শক্তি পায়···সব-কিছুই পায়। তা নয়,...সখ হয়েছে বেড়াতে আসবার···তার উপর দার্জ্জিলিংয়ে বেড়াতে আসা হলো মস্ত ফ্যাশন! যদি বলো সখের জন্য এসেছি তো মানতে রাজী আছি! তা না বলে তোমাদের ঐ সব স্বাস্থ্য শক্তি-সামর্থ্য...ও সব কথা তুললেই না তর্ক বাধে!

আদিত্য শিহরিয়া চুপ করিয়া রহিল! যার টাকা আছে···পৈত্রিক সম্পত্তি নয়···নিজে খাটিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিতেছে, তার কাছে টাকা রোজগারেই স্বাস্থ্য-শক্তি-সামর্থ্য···চেঞ্জ বা খেলা-ধূলাকে সে ব্যক্তি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে! এমন কথা দু'চার জনের মুখে শুনিয়াছে। কথাটা হয়তো সত্য! এবং মিথ্যা যে নয়, চিন্তাহরণ তার পরম দৃষ্টান্ত!

ভাবিল, উনি রাগ করিলেন? সে গরীব···তার উপর উনি জানেন, গল্প-উপন্যাস লিখিয়াই তার উপার্জ্জন। উপার্জ্জনের এ ভিত্তিকে অতিশয় তুচ্ছ বলিয়াই চিন্তাহরণের ধারণা, আদিত্য এ-কথা শুনিয়াছে! আরো শুনিয়াছে, তার সঙ্গে জাহ্নবীর বিবাহ দিতে চিন্তাহরণের যে-মত, সে মতের নির্ভর জাহ্নবীর জিদটুকু ছাড়া আর কিছুর উপরে নয়! আদিত্যের দার্জ্জিলিং আসাকে গরীবের অনুপযোগী বিলাস বলিয়া হয়তো চিন্তা-হরণের ধারণা! তা যদি হয়···

গিরিবালা করিলেন স্বামীর কথার প্রতিবাদ। বলিলেন—তোমার মতো মানুষ ··শুধু তুমিই আছো একা! না হলে টাকা-পয়সা রোজগারের সঙ্গে পৃথিবীর পানেও চাইতে হয়! তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না!

এ সম্বন্ধে বাদানুবাদে চিন্তাহরণের রুচি ছিল না। জাহ্নবীর পানে চাহিয়া চিন্তাহরণ বলিলেন—বিদেশীকে বল্, আদিত্যর জন্য চা দিয়ে যাবে। খাও আদিত্য, চা খাও···তার পর চলো, একসঙ্গে সব বেড়িয়ে আসি। জাহ্নবী বলছে কি ওর ভিক্টোরিয়া ফল্স। বেড়াতে এসেছো, বেড়াও। উনি যা বললেন, পৃথিবী দেখা·· ভালো। মানি।··কিন্তু পৃথিবীর পানে চাইবে কখন? যখন নিজেকে কায়েমী করে' পৃথিবীতে দাঁড় করাতে পারবে, তখন। তার আগে নয়!···যাক···

জাহ্নবীর ভালো লাগিল না। মানুষ আসিবামাত্র এমনি করিয়া তাকে দমাইয়া দেওয়া! তবে বাপের স্বভাব সে জানে···ওজন করিয়া কথা বলেন না। একালে যাকে ফর্মালিটি বলে, সে ফর্মালিটির তিনি ধার ধারেন না। যার সঙ্গে কথা বলেন না, তাকে রসাতলে যাইতে দেখিলেও বাবা একটি কথা বলিবেন না! আবার যার সঙ্গে বলেন, তার কাছে কথার কোনখানে এতটুকু বাধা-বন্ধ থাকে না!···

সে বলিল—বিদেশীকে তাড়া দিয়ে আমি চা আনাই!···তুমিও চলো মা বেড়াতে!···বাড়ীর সামনে দু'-পা চার-পা চলা ছাড়া এক দিনও কোথাও তোমাকে দূরে নিয়ে যেতে পারলুম না! ওঠো···কাপড়-খানা বদ্‌লে গরম কাপড়-চোপড় পরো। এখানে আসবার সময় তোমার জন্য যে নতুন গরম কোট তৈরী করানো হলো, সেইটে পরে এসো। বুঝলে·· নাও, ওঠো। দেরী নয়।

গিরিবালা বলিলেন—আমাকে টানাটানি করিস কেন? তোরা হাঁটবি ঘোড়ার মতো, আমার কি পায়ে হাঁটা অভ্যাস আছে! হুঁঃ তোমার, ওঁর পাল্লায় পড়ে গাড়ী চড়ে-চড়ে পায়ের মাথা খেয়ে বসে আছি, ছাই!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া গিরিবালা চাহিলেন আদিত্যর পানে। বলিলেন শুধু চা নয় বাবা, ঘরে বগলা চমৎকার খাজা তৈরী করেছিল...দু'খানি সেই খাজা খাও, আর তার সঙ্গে চা।

আদিত্য কৃতার্থ মনে বলিল—খাবো।

গিরিবালা বলিল—রাত্রে এইখানেই খাও না আজ!

আদিত্য কি জবাব দিবে, স্থির করিতে পারিল না। নিমেষের দ্বিধা!

সে দ্বিধা ভাঙ্গিয়া চিন্তাহরণ বলিলেন—হোটেলে বলে আসতে হয় তাহলে! তারা রাত্রে খাওয়ার চার্জ্জ নেবে। তার চেয়ে কাল তোমার এখানে খেতে বলো...হোটেলে ও আগে থেকে বলে দেবে, তাহলে বাজে পয়সা খরচ হবে না।

আদিত্য বলিল—তাই হবে। কাল রাত্রে খাবো তাহলে!

গিরিবালা বলিলেন—বেশ, তাহলে এই কথাই রইলো।

আদিত্য মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, যে-মানুষ টাকা জমায়; কত দিকে তার লক্ষ্য! রাত্রে হোটেলের খাওয়ার ব্যয় কতই বা তার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না! কিন্তু চিন্তাহরণের কি গভীর লক্ষ্য! সাধে তিনি এত টাকার মানুষ! কথায় বলে একটি পয়সাকে তুচ্ছ ভাবিয়ো না...সেই একটি পয়সাই তোমাকে লক্ষ পয়সা আনিয়া দিবে!...পয়সার দাম জানে না বলিয়াই সে এমন লক্ষ্মীছাড়া!

ছয়

ক'জনে বেড়াইতে বেড়াইতে পথে অনেকদূর চলিলেন।...ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্ দেখা হইল! কাকজোরা নদী...পাহাড়ের গা বহিয়া কত নীচে নামিয়া গিয়াছে। কাকচক্ষু জল!

গিরিবালা বলিলেন—কাছাকাছি দেখবার এত সব জিনিষ রয়েছে ... তা আমাকে কি একদিন নিয়ে আসতে নেই জাহ্নু?

হাসিয়া জাহ্নবী বলিল—বা রে, আমি তো তোমাকে রোজ বলি একটু বেড়িয়ে আসবে চলো মা...তুমিই তো সংসারে সতেরো রকমের কাজ আছে বলে বেরুতে চাও না!

গিরিবালা বলিলেন—সাধে চাই না? পাহাড়ে পথ...একবার নামো, একবার ওঠো! ...বয়স যখন অল্প ছিল, পাঁচ জনে দার্জ্জিলিং বেড়াতে আসতো, ওঁকে কতবার তখন বলেছি যে চলো না গো, সকলে যায়...একবার দার্জ্জিলিং চলো...ওঁর কি অবসর হয়েছিলো কখন আসবার? এবারে যে এসেছেন, সে দার্জ্জিলিংয়ের ভাগ্যি। তাও

দার্জ্জিলিংয়ের জন্য দার্জ্জিলিংয়ে আসেন নি, এসেছেন ঐ সরকারী পুল তৈরীর কাজে।

চিন্তাহরণ বলিলেন—শুধুই ঘুরবি রে জাহ্নবী?···কোথাও বসবি না?

হাসিয়া জাহ্নবী বলিল—তোমার পা ব্যথা করছে বুঝি?

চিন্তাহরণ বলিলেন—একটু করছে বৈ কি! সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরেছি···তাতে কম মেহনত হয় নি।···বাড়ী ফিরে তাই হাত-পা ছড়িয়ে একটু আরাম খুঁজি!···ঐ যে ঐ ঝাউ গাছটা···পাশে বেশ বড় বেঞ্চি···চ', ঐ বেঞ্চিতে গিয়ে সকলে বসি।

সকলে আসিয়া বসিল পথের ধারে পাথরের বেঞ্চে।

জাহ্নবী বলিল—একটি দিন তুমি আমার কথা শোনো বাবা, আমার সঙ্গে ঘুরে দার্জ্জিলিং ছাখো!···কাজ তো করছো সারা জীবন। একটি দিন···যাকে বলে হলিডে···কি বলো?

মৃদু হাস্তে চিন্তাহরণ বলিলেন—হুঁ। আচ্ছা, বেশ, রাজী আছি।

জাহ্নবীর আনন্দের সীমা নাই! সে বলিল—কবে? কাল তাহলে?

চিন্তাহরণ বলিলেন—কাল নয়। কাল আমাদের একগাড়ী জয়েন্ট আসছে···দেখে এ্যাপ্রুফ্ করবার কথা আছে। কাল নয়···

জাহ্নবী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, বলিল—তবেই আর হয়েছে!

—না রে না, হবে'খন।

জাহ্নবী বলিল—কবে...তোমাকে বলতে হবে। পরশু?

—উঁহু···পরশুও নয়। প্রাইস সাহেবের সঙ্গে পরশু শিলিগুড়ি যেতে হবে।

জাহ্নবী বলিল—এই হপ্তাতেই কিন্তু তোমায় হলিডে চাই!

চিন্তাহরণ বলিলেন—বেশ, সামনের বেস্পতিবার!

জাহ্নবী বলিল—বেশ…বেস্পতিবারই হোক! কিন্তু বাড়ী গিয়ে তোমার ডায়েরিতে লিখে রাখবে। সেদিন সকালে চা খেয়ে আমরা বেরুবো…সঙ্গে খাবার-দাবার নেওয়া হবে। আর সঙ্গে থাকবে খান্ দুত্তিন্ রিকশ-গাড়ী, বুঝলে?…বাংলোর নীচে ভুটিয়া বস্তী…সেখানে আছে গোম্ফা। গোম্ফা দেখে আমরা পার্ক-ভিউ পার্কে যাবো। সেই পার্কে বসে খাওয়া-দাওয়া করবো। তার পর…আচ্ছা, আজই বাড়ী গিয়ে আমি সারা দিনের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলবো…কেমন?

চিন্তাহরণ বলিলেন—বেশ।

জাহ্নবী বলিল—সেদিন যে ফের তুমি কাজের ছল করবে…তা করতে পাবে না। করলেও আমি শুনবো না। আমার প্রোগ্রাম যদি তুমি মাটী করে দাও, তাহ'লে আমি শুকুরবারের ট্রেণে কলকাতা চলে যাবো…একলা…কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না—বুঝলে?

চিন্তাহরণ বলিলেন—হুঁ!

জাহ্নবী বলিল—আমাকে চেনো তো।

তুঙ্গ গিরির বুকে বসিয়া যেদিকে চাহিয়া ছাখো, কি বিচিত্র শোভা…ওদিকে ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা…

জাহ্নবী বলিল—ঐ হলো কাঞ্চনজঙ্ঘা। আচ্ছা বলুন তো আদিত্য বাবু, আপনি তো মস্ত লেখক, কাঞ্চনজঙ্ঘা কথাটা এলো কোথা থেকে?

আদিত্য বলিল—কাঞ্চন বর্ণের জঙ্ঘা…তাই না কি?

হাসিয়া জাহ্নবী বলিল—না। তিব্বতী কথা আছে কাং-ছেন-

দাজাং-গা। তাই থেকে হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আপনার সোনার জঙ্ঘার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তিব্বতী কথার মানে হলো সোনার তোষাখানা।

মেয়ের গবেষণায় মা গিরিবালার মন গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল। গিরিবালা বলিলেন—তুমি এই প্রথম এলে দার্জ্জিলিং আদিত্য?

আদিত্যর মনে আবার দ্বিধা। ভাবিল, সে এই প্রথম আসিয়াছে সত্য…কিন্তু সেকথা বলিলে যদি চিন্তাহরণ ভাবেন, জাহ্নবীর জন্ত আসিয়াছে এত টাকা খরচ করিয়া! হয়তো আবার রাগ করিবেন! তাছাড়া…

তাই সে বলিল—না, আমরা শিলিগুড়িতে থাকতুম ছেলেবেলায়। শিলিগুড়িতেই আমার জন্ম। দার্জ্জিলিংয়ে প্রায় আসতুম। এখন কলকাতায় আছি, কাজেই সব সময় আসা হয় না, তবু মাঝে মাঝে আসি। এ জায়গা আমার এত ভালো লাগে! মস্ত আকর্ষণ! দু'দিন বিশ্রাম নেবার দরকার হলে আমি দার্জ্জিলিংয়ে আসি, আর কোথাও যাই না। জানা-শুনা বন্ধু-বান্ধবও এখানে আছেন।

এত কথা বলিবার প্রয়োজন হয়তো ছিল না! কিন্তু কথার পিঠে কথা একেবারে ভিড় করিয়া জমিতে লাগিল! তাছাড়া মনে হইতেছিল, গিরিবালার প্রশ্নের উত্তরে এ কথাগুলো বলা ভালো! বাড়ীতে চিন্তাহরণ বিলাসের যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, সে ইঙ্গিত ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবে! অর্থাৎ তার দার্জ্জিলিং আসায় বিলাস নাই! শিলিগুড়িতে জন্ম…এখানে পাঁচবার আসিয়াছে, তাই কোথাও বাহির হইতে গেলে এখানকার কথাই সকলের আগে মনে জাগে!

দু-চার দিনে এ বাড়ীর সঙ্গে আদিত্যর চমৎকার বনিয়া গেল। পয়সার সাধনায় চিন্তাহরণ সারাদিন বাহিরে থাকেন। জাহ্নবীর সঙ্গে সকালে খানিকটা ঘুরিয়া বেড়ানো...গিরিবালাকেও সঙ্গে লইয়া বাহির হয়। ঘণ্টা-খানেক হাঁটিবার পর গিরিবালা বলেন, আর নয় বাবা, আমি এখন ফিরি। জাহ্নবী বলে, এর মধ্যে বাড়ী ফিরবো কি? না, ঠিক করেছি কাল দূরের ঐ পাহাড়টা পর্য্যন্ত যাবো। গিরিবালা বলেন, আমি আর পারছি না মা চলতে! তার উপর সংসার আছে। আদিত্য বলে জাহ্নবীকে,—তুমি ঐ পথ দিয়ে সেই ওধারে গিয়ে ওয়েট্ করো, মাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আমি গিয়ে তোমায় মীট্ করবো।

তাই হয়। মা চলিয়া আসেন এবং মায়ের উপর আদিত্যর এত-খানি দরদ...

এ দরদ নিজের পেটের মেয়ের কাছে গিরিবালা পান নাই। জামাই! এখনো জামাই হয় নাই...মা বলিয়া ডাকিয়া এতখানি দরদ করিতেছে! নারীর স্নেহ-কাঙাল মন...আদিত্যর উপর মায়ের মায়া দু'দিনে নিবিড় হইয়া উঠিল।

বুধবার সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া আসিয়া আদিত্য বিদায় চাহিল।

জাহ্নবী বলিল—একটা কথা আছে।

—কি কথা?

জাহ্নবী বলিল—নতুন বিলিতী স্যুট্ করিয়ে এনেছেন, সে স্যুট্ পরে একদিনও আসেন না কেন?

আদিত্য বলিল—লজ্জা করে।

জাহ্নবী বলিল—লজ্জা করে যদি তো ও-পোষাক করালেন কেন? বাবা সাধে বলে, বাজে খরচ!

আদিত্য বলিল—তোমার চিঠি পড়ে কিনেছিলুম। তোমরা এখানে সাহেবী ষ্টাইলে আছো...ব্যারিষ্টার বন্ধু-বান্ধব তোমাদের বাড়ীতে আসেন। দেশী ধুতি পরে এলে যদি খাপ খেতে না পারি। বিশেষ···

কথা বাধিয়া গেল।

জাহ্নবী বলিল—বিশেষ···কি? বলুন···

আদিত্য বলিল—সকলের কাছে পরিচয় করিয়ে দাও যদি···তোমার সঙ্গে···

জাহ্নবীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। জাহ্নবী বলিল—নতুন করে পরিচয়ের দরকার হবে না। মুকুল বাবুরা জানেন। মুকুল বাবুর মায়ের কাছে মা বলেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মেয়ের বিয়ের কি করছেন? তাতে মা জবাব দিলে, বিয়ের ঠিক হয়ে আছে...সামনের বোশেখ মাসের তের তারিখে বিয়ে। মুকুল বাবুর মা জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে কি করে? তাতে মা বললে, মস্ত লেখক···এখন ভালো-ভালো যা কিছু গল্প উপন্যাস বেরুচ্ছে, সে সব ঐ জামাইয়েরি লেখা!

আদিত্য শুনিল; কোনো জবাব দিল না।

জাহ্নবী বলিল—শুনে ভাব লাগলো? কি ভাবা হচ্ছে?

আদিত্য বলিল—কি ভাবছি? ভাবছি, এ কি সত্য জাহ্নবী যে তুমি আমাকে ভালোবাসো! এত ভালোবাসো যে আমার মতো লক্ষ্মীছাড়া হতভাগার গলায় বরমাল্য দেবে!

জাহ্নবী চারিদিকে চাহিল···তারপর কণ্ঠ মৃদু করিয়া বলিল—এর পরেই আপনার সেই 'মনোবীণা' উপন্যাসের নায়িকা হৈমবতীর কথায় আমি জবাব দি,—'উপন্যাসের মধ্যে এ সব গাল-ভরা কথা কোনোমতে সওয়া যায়, সত্যিকার জীবনে কিন্তু জলবিছুটির জ্বালা ধরায়! উপন্যাসের নায়িকা যখন নায়ককে ডাকে,—প্রিয়তম···জীবনবল্লভ···তখন মন্দ লাগে না! কিন্তু সত্যিকার জীবনে নায়িকা যদি নায়ককে ঐ কথা বলে' ডাকে, নায়ক তাহলে হো-হো করে হেসে উঠবে···বলবে,—আঃ, কি তামাসা করছো!'

আদিত্য শুনিল একাগ্র-মনোযোগে। জাহ্নবীর কথায় কি ছিল··· আদিত্যর মনোবীণার তারগুলা সে কথার ঘায়ে ছিঁড়িয়া গেল।···

জাহ্নবী বলিল—আবার ভাব লাগলো না কি?

আবেগ-ভরে জাহ্নবীর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া আদিত্য বলিল—সত্যি ভাব লেগেছে, জাহ্নবী! আমার এ-লেখা তুমি এমন করে মনে রেখেছো। আমার এ-লেখা যদি পৃথিবীর আর কোনো লোক না পড়তো···কিম্বা পড়ে বলতো কিচ্ছু হয়নি, তাতেও আমার কোনো দুঃখ থাকতো না!···আমার এ-লেখা সার্থক যে তুমি পড়েছো এমন করে'!

হাতখানা টানিয়া লইয়া জাহ্নবী বলিল—কবিত্ব নয়, আমি যা বলছিলুম···

—বলো···

জাহ্নবী বলিল—কাল সকালে বেরুবার কথা···মনে আছে? বেস্পতিবার।···সকালে এখানে চা খেতে আসবেন···সেই বিলিতি স্যুট পরে'···বুঝলেন? ধুতি নয়।

আদিত্য বলিল—বিলিতি স্যুট ?

—হ্যাঁ। অত টাকা দিয়ে তৈরী করে ফেলে রাখবার কোনো মানে হয় না। কলকাতায় গিয়ে ও-স্যুট যে আপনি কোনো দিন পরবেন না, এ আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি।…সেখানে সব চেনা লোক। এখানে ও-স্যুট পরে' গায়ে সইয়ে অভ্যাস করে নিন। আমারো খুব ইচ্ছে করছে কাল আপনি ঐ স্যুট পরে' আমাদের এখানে আসবেন! ঐ স্যুট পরেই পিক্‌নিকে যাবেন!

আদিত্য বলিল—সারাদিন ঐ পোষাক পোরে থাকবো ?

—নিশ্চয়।…না হলে…

আদিত্য আর দ্বিরুক্তি করিল না…বলিল,—বেশ।

বৃহস্পতিবার।

জাহ্নবীর কথামতো আদিত্য সাহেবী-সাজে তাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

চিন্তাহরণ কহিলেন—বাঙলা বই লিখলেও এ পোষাকে তোমার অরুচি নেই ?…ভালো!

গিরিবালা বলিলেন—আচ্ছা, ও-পোষাক কে না এখন পড়ছে ?… তাছাড়া কোনোদিন তো ওর খোঁজ-খপর নিলে না…লোহা মাথায় বয়েই দিন কাটাচ্ছো!…ওদের খুব বড় কাঠের কারবার ছিল শিলি-গুড়িতে…মা-বাপ অল্প-বয়সে মারা গেল…তারপর যা হয়ে থাকে!

যে-সব ভৃত ছিল বাপের আশ্রিত, কারবারটাকে লুঠে তারা খেয়ে ফেললে! আহা!

চিন্তাহরণ বলিলেন—শিলিগুড়িতে তোমার বাপের কাঠের কারবার! বাবার নাম?

আদিত্য বলিল—দুর্গাবাবু···দুর্গাচরণ চৌধুরী।

চিন্তাহরণ স্মৃতির গহনে কিছুক্ষণ যেন সন্ধান করিলেন! তারপর বলিলেন—না, চিনি না।

টয়লেট সারিয়া জাহ্নবী আসিয়া দেখা দিল। বলিল—বাঃ, বিদেশীকে এখনো চা দিতে বলোনি!···বলিয়াই সে হাঁকিল—বিদেশী···

বিদেশী জবাব দিল—নিয়ে যাচ্ছি দিদিমণি···

বিদেশী আসিল ট্রেতে লইয়া চায়ের কেট্‌লি, পেয়ালা···

জাহ্নবী বলিল—ঠাকুরকে বল্‌ মোহনভোগ আর লুচি-টুচি দিয়ে যেতে। তারপর তুই আর দেরী করিসনে, তৈরী হয়ে নে। বড় টিফিন-ক্যারিয়ারে রান্না মাংস আর ঠাকুর যা যা দেয়, ভরে নে। রিক্‌শ এসেছে?

বিদেশী বলিল—হাঁ। দোঠো এসেছে।

জাহ্নবী বলিল—আর একখানা আসবে। তিনখানা হলেই চলবে। আমরা হেঁটে যাবো। মার যদি চলতে কষ্ট হয়, মার জন্ম একটা রিক্‌শ; একটায় থাকবে খাবার-দাবার, আর একখানা থাকবে খালি···সঙ্গে সঙ্গে যাবে। যার দরকার হবে, চড়বে।

চিন্তাহরণ বলিলেন—সেটি আমার জন্ম রিজার্ভ রইলো!···তোমার হাতে যখন পড়েছি, জানি, নাস্তা-নাবুদ না করে' ছাড়বে না।

জাহ্নবী বলিল—নাস্তা-নাবুদ মানে ?

চিন্তাহরণ বলিলেন—কোথায় কতদূর পর্য্যন্ত মার্চ্চ করাবে, কে জানে !

জাহ্নবী হাসিল, হাসিয়া বলিল—সত্যি বাবা, আমিও এখন তা জানি না। দার্জ্জিলিংয়ের পথে-পথে যতখানি পারি, ঘুরবো…যতক্ষণ না সূর্য্যাস্ত হয় ! বাইরে থেকে সূর্য্যাস্ত দেখে তবে বাড়ী ফিরবো।

গিরিবালা বলিলেন—বগলা যাবে বলে বায়না করছিল…সে যাবে রে।

জাহ্নবী বলিল—না মা, ও বাড়ীতে থাকুক। আবার এর পর যেদিন যাবো, সেদিন ওকে সঙ্গে নেবো।

চা ও লুচি-মোহনভোগের পর্ব্ব সারিয়া রিক্‌শয় খাবার-দাবার তুলিয়া দেওয়া হইল। তারপর যাত্রা…

ফটকের বাহিরে পা দিয়াছে, সামনে মুকুল…সঙ্গে তার বোন্ সীতা।

মুকুল বলিল—কোথায় চলেছেন সব ?

চিন্তাহরণ বলিলেন—জাহ্নবীর সখ, সারাদিন ঘোরাবে। বলে,…হন্টিডে।

জাহ্নবী বলিল—কালিম্পং থেকে কবে ফিরলেন ?

—কাল রাত্রে। ঠ্যাংলা-গাড়ীতে করে এসেছি।

সীতা বলিল—চমৎকার লাগলো ভাই জাহ্নবী।

গিরিবালা বলিলেন—সকলে ফিরেছো ? মা ? বাবা ?

সীতা বলিল—না, বাবা-মা ফেরেননি। আমরা দুজনে শুধু।… ভারী ফাঁকা লাগছিল ! কথা কবো, এমন লোক নেই, মাসিমা।

জাহ্নবী বলিল মুকুলকে—যাবেন আমাদের সঙ্গে? চলুন না… বেশ হবে।

মুকুল চাহিল সীতার পানে। সীতা বলিল—চলো দাদা। সত্যি! এখানে এলুম…কদিনের এক-রাশ খপর জড়ো হয়ে আছে…জাহ্নবীকে বলবে, বলেছিলে…

জাহ্নবীর মুখে আনন্দের দীপ্তি! জাহ্নবী বলিল—সত্যি? কি খপর, মুকুলবাবু?…না, তাহলে ছাড়বো না। আসুন আমাদের সঙ্গে।

মুকুল বলিল—কখন ফেরা হবে?

জাহ্নবী বলিল—বাইরে সূর্য্যাস্ত দেখে।

মুকুল বলিল—আমার বাড়ীতে বয়টয় কিন্তু সব ভেবে আকুল হবে।

সীতা বলিল—এখানে কেউ নেই? কাউকে দিয়ে খপর পাঠিয়ে দাও না।

জাহ্নবী বলিল—হ্যাঁ…হ্যাঁ…হ্যাঁ।

তার আগ্রহ প্রখর ভাবে উচ্ছ্বসিত হইল!…জাহ্নবী ডাকিল বিদেশীকে, বলিল—নাগিনাকে বল্, এখনি মুকুল সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে খপর দিয়ে আসবে, সাহেব আর দিদিমণি রাত্রে বাড়ী ফিরবে।

বিদেশী গেল নাগিনাকে ডাকিতে।

মুকুলের হাত ধরিয়া জাহ্নবী টানিল, বলিল—আসুন। বলতে বলতে চলুন রাজ্যের কি সব খপর সংগ্রহ করে এনেছেন!…তোমরা? মা…বাবা…আদিত্যবাবু…

কথাটা বলিয়া জাহ্নবী কিন্তু কাহারো পানে তাকাইল না, মুকুল এবং সীতাকে লইয়া পথে বাহির হইল।

তাদের পিছনে গিরিবালা। গিরিবালা বলিলেন—এখনি গাড়ীতে চড়বো না। পা ব্যথা করলে চড়বো'খন।

গিরিবালা ও চিন্তাহরণের সঙ্গে চলিল আদিত্য; এবং সকলের পিছনে তিনখানা রিক্‌শর পরিচালক-রূপে ভৃত্য বিদেশী।

পিক্‌নিকের নামে আদিত্যর মন যে-রঙে রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, সে-রঙ কোথায় মিলাইয়া গেল! সে চলিয়াছে···কোনোমতে যন্ত্র-চালিতের মতো···সামনে ঘন কুয়াশার রাশি। মনে হইতেছিল, এত দিনের যত কুয়াশা সব যেন আজ জমাট ঘন বাষ্পে ভরিয়া চারিদিক ঢাকিয়া অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে!

সাত

ভুটিয়া বস্তী, গোম্ফা পার্ক ভিউ···কোথাও আমোদ জমিল না! মুকুল এবং সীতাকে লইয়া জাহ্নবী এমন মত্ত যে আদিত্যর পানে চাহিবার কথা সে ভুলিয়া গেল! পার্ক-ভিউয়ে চিন্তাহরণ আসিয়া একটা বেঞ্চে সেই যে বসিয়া পড়িলেন বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠিতে চান্ না! গিরি-বালার পা টন্‌টন্ করিতেছিল, তাঁকে কখনো রিক্‌শয় চাপাইয়া, কখনো বা তাঁর সঙ্গে হাঁটিয়া অর্থাৎ তাঁর হেফাজতীতেই আদিত্যকে কায়-মন ঢালিয়া দিতে হইল।

বেলা তখন বারোটা···পার্ক-ভিউয়ে তৃণশয্যায় বসিয়া গিরিবালা চাহিলেন চিন্তাহরণের পানে। বলিলেন—কটা বাজলো গা?

ঘড়ি দেখিয়া চিন্তাহরণ বলিলেন—তা বেশ! বারোটা বেজে বিশ মিনিট।

হতাশভাবে চারদিক চাহিয়া গিরিবালা বলিলেন—এরা গেল কোথায়? তোমার মেয়ে, মুকুল আর সীতা?

চিন্তাহরণ বলিলেন—দিগ্বিজয় করে বেড়াচ্ছে তিনজনে!

গিরিবালা চাহিলেন আদিত্যর পানে। আদিত্য নিঃশব্দে বসিয়াছিল একখানা বেঞ্চে। গিরিবালা ডাকিলেন—আদিত্য।

আদিত্য ফিরিয়া চাহিল; কহিল—আমায় ডাকছেন?

গিরিবালা বলিলেন—হ্যাঁ। খিদে পেয়েছে তো?

আদিত্য সলজ্জভাবে মাথা নামাইল, জবাব দিল না।

চিন্তাহরণ বলিলেন—খিদে পাবে না? খিদের অপরাধ? ঘোড়দৌড় করে বেড়াচ্ছে! তার উপর বারোটা বেজে গেছে।

গিরিবালা বলিলেন—ছাখো দিকিনি মেয়ের কাণ্ড! ছুটোপাটি করে বেড়াচ্ছে! একবার ছাখো তো বাবা আদিত্য, কোথায় গেল সব। ডাকো সকলকে। বলো, মা ডাকছেন, খাবার দেওয়া হচ্ছে!

গিরিবালার কথায় আদিত্য উঠিল। গিরিবালার হেফাজতী করিলেও সে লক্ষ্য রাখিয়াছিল জাহ্নবীর দিকে। পার্কে আসিয়া গিরিবালার হাত ধরিয়া তাঁকে যখন সে রিকৃশ হইতে নামাইতেছিল, তখন অদূরে পাইন-কুঞ্জের আড়ালে মুকুলের সঙ্গে জাহ্নবীকে ছুটিয়া সে অদৃশ্য হইতে দেখিয়াছে, তাদের পিছনে সীতা চলিয়াছে যেন সম্পূর্ণ দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছায় শ্লথ ভঙ্গীতে। এ দৃশ্য দেখিয়া অবধি তার মনের মধ্যে যা হইতেছে…অল্ কোয়ায়েট ফিল্মে দেখিয়াছিল রণ-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মার্চ্চ করিয়া চলিয়াছে অসংখ্য ফৌজ…তার মনের মধ্যেও তেমনি ফৌজের মার্চ্চ!

গিরিবালার কথায় আদিত্য উঠিয়া সেই পাইন ঝাড়ের দিকে চলিল।

পাইন ঝাড়ের নীচেই খানিকটা খাদ। খাদের উপরে আসিবামাত্র আদিত্য চাহিয়া দেখে, নীচে একটা পাথরের চাঙড়ে জাহ্নবী বসিয়া আছে···একখানি পা প্রসারিত—সীতা নির্বাক দাঁড়াইয়া আছে জাহ্নবীর পাশে এবং মুকুল জাহ্নবীর সেই প্রসারিত পাখানা ধরিয়া সেই পায়ের সেবা করিতেছে।

আদিত্যর মাথায় রক্ত চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল। ফিরিয়া আসিবে কি না···চকিতের দ্বিধা···এমন সময় সীতা তাকে লক্ষ্য করিল, ডাকিল—আদিত্য বাবু···

আদিত্য সরিয়া আসিতে পারিল না···চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সীতা বলিল—এখানে আসুন।

যন্ত্রচালিতের মতো আদিত্য গিয়া কাছে দাঁড়াইল।

দুচোখের দৃষ্টিতে একরাশ বেদনা ভরিয়া জাহ্নবী বলিল—পায়ে চোট লেগেছে!

সীতা বলিল—যে লাফিয়ে নামছিলে, লাগবে না? দাদার সঙ্গে হলো বাজি, জানলেন আদিত্যবাবু, বললে, লাফাতে লাফাতে একেবারে নীচে নেমে যাবে···ঠোক্কর লেগে পড়ে গেল···

জাহ্নবী বলিল—ভাগ্যে মুকুল বাবু এসে ধরলেন, না হলে গড়িয়ে কোথায় গিয়ে পড়তুম!···

মুকুল একাগ্র মনে পায়ের সেবা করিতেছিল; এ-সব কথার জবাব দিল না...আদিত্যর পানে চাহিয়াও দেখিল না।

আদিত্য গুম্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জাহ্নবী বলিল—আপনি হঠাৎ এদিকে এলেন যে!

আদিত্য বলিল—আপনার মা বললেন খাবার দিচ্ছেন—সকলকে ডেকে আনো।

জাহ্নবী বলিল—পা ছাড়ুন মুকুল বাবু…বোধ হয় হাঁটতে পারবো।

মুকুল বলিল—ঠিক তো? উঠতে হবে পাহাড়ের গা বেয়ে!

জাহ্নবী বলিল—চেষ্টা করে দেখি। এখানে বসে থাকলে তো চলবে না!

সীতা বলিল—তোমার জুতো কোথায় গেল? জুতো? দাও আমার হাতে।

খোলা জুতা অদূরে পড়িয়াছিল…কুড়াইয়া সীতা সে জোড়া হাতে লইল!

জাহ্নবী বলিল—এবার আমি উঠি। কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলেন মুকুল বাবু…পদসেবা করতে হলো!

সহাস্যে সীতা বলিয়া উঠিল—মেয়েদের রাঙা পায়ের সেবা…অনেক সৌভাগ্য থাকলে তবে সে অধিকার মেলে! কি বলো দাদা?

সীতার কথায় মুকুলের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

জাহ্নবী বলিল—ভারী ফাজিল হয়েছো তুমি সীতা…তাছাড়া আমার পা রাঙা নয়। রাঙা বরং তোমার পা দু'খানি। ঐ পা দু'খানি এগিয়ে দিলে না কেন? মুকুল বাবুর সৌভাগ্য দেখে তখন আদিত্য বাবুর হিংসা হতো!

সীতা বলিল—করো তোমরা রঙ্গ! আমার খিদে পেয়েছে… মাসিমা ডাকছেন, আমি পালাই…

এ কথা বলিয়া সীতা দাঁড়াইল না…পাহাড় ভাঙ্গিয়া উপরে পার্কের দিকে চলিল।

পাথর ধরিয়া জাহ্নবী উঠিয়া দাঁড়াইল। চলিবার উদ্দেশ্যে পা তুলিল। পা কাঁপে…পড়িয়া যাইতেছিল…মুকুল খপ্ করিয়া তার হাত ধরিল।

হাত ধরিয়া মুকুল বলিল—উঠতে পারবেন না…চলার চেষ্টা করে কাজ নেই।

অনুযোগের স্বরে কণ্ঠ ভরিয়া জাহ্নবী বলিল—বা রে, আমি তবে এইখানে থাকবো নাকি ?

মুকুল বলিল—থাকবেন কেন! আমরা দুজন আছি…আদিত্যবাবু আর আমি…আমরা আপনাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মাসিমার কাছে পৌঁছে দেবো!

জাহ্নবী বলিল—না…না…না। ইট্ উড বী সো ক্লাম্‌সি।

মুকুল বলিল—আতুরে নিয়ম নাস্তি! বলিয়া সে চাহিল আদিত্যর পানে, বলিল—আমি পায়ের দিক ধরছি…আপনি পারবেন মাথার দিক ধরতে ?

আদিত্যর চোখের সামনে শুধু ধোঁয়ার চক্র…কোনোমতে আদিত্য বলিল—আমি বরং পায়ের দিক ধরি।

—বেশ…বলিয়া জাহ্নবীকে ধরিয়া মুকুল তাকে প্রায় বক্ষলগ্ন করিল। করিয়া বলিল—ধরুন আপনি পা…

জাহ্নবী বলিল—পার্কে উঠেই কিন্তু ছেড়ে দেবেন…সত্যি! না হলে লোকে দেখলে হাসবে।

—আচ্ছা…

পার্কে আসিয়া জাহ্নবী বলিল—ছেড়ে দিন…লেভেল জমি।

আমি হাঁটতে পারবো···আপনারা দুজনে না হয় আমার হাত ধরে থাকুন।

তাহাই হইল। দুজনে হাত ধরিয়া জাহ্নবীকে আনিয়া বসাইয়া দিল গিরিবালার কাছে বেঞ্চে। সীতার মুখে গিরিবালা এবং চিন্তাহরণ শুনিয়াছেন দুর্ঘটনার কথা। শিহরিয়া গিরিবালা কহিলেন—পা ভেঙ্গে যায়নি তো ?

মেয়েকে দেখিয়া মুকুল কহিল—না···স্প্রেন।

গিরিবালার চোখের পলক পড়ে না। বিস্ফারিত নেত্রে বহু উদ্বেগ জমিতে লাগিল। জাহ্নবীর পানে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

সীতা বলিল—আমি অনেক মানা করেছি মাসিমা। দাদার সঙ্গে বাজি রেখে বললে লাফাতে লাফাতে খাদে নামবো—ব্যস্ !

গিরিবালা বলিলেন—তুই তো এমন ছিলি না জাহ্নবী !

মুকুল বলিল আমার দোষ নেই মাসিমা···আপনার মেয়েই আমায় বললেন, পারেন আপনি লাফাতে লাফাতে খাদে নামতে ? আমি বললুম, না। তাতে আপনার মেয়ে বললেন, আমি পারি। বাজি রাখুন। বাজি আমি রাখিনি···বাজি রাখবার আগেই উনি নামতে সুরু করলেন।

আট

পায়ের ব্যথায় তিনদিন জাহ্নবীর শয্যা ছাড়িয়া নড়িবার সামর্থ্য রহিল না। এ তিনদিন আদিত্যর বুকে যেন ভারী তিনখানা পাথর চাপাইয়া বুকখানাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল! মন এ-বাড়ী ছাড়িয়া নিমেষের জন্য বাহিরে কোথাও যাইতে চায় না! লজ্জা ত্যাগ করিয়া কোনমতে বলিয়াছিল গিরিবালাকে—আপনি যদি বলেন, এইখানে থেকে আমি সেবায় সাহায্য করতে পারি, মা।

গিরিবালা বলিলেন—না, না, যে মেয়ে, কারো সেবা পছন্দ করে না বাবা! তাহলে যে হার মানতে হবে!

জাহ্নবীকে একা পাইয়া অস্ফুট ভাষায় ইঙ্গিতে জানাইয়াছিল—এলুম তোমার অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করতে···তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবো! না, পায়ে চোট লাগিয়ে তুমি বিছানা নিলে! এখান থেকে নড়তে আমার মন চায় না।

জাহ্নবী বলিল—বেশ তো, যে ক'দিন আমি নড়তে পারবো না, ঘরে বসে একখানা বই লিখে ফেলুন···

আদিত্যর মন ছাঁৎ করিয়া উঠিল! জাহ্নবী চায় না তার সঙ্গ, অথচ চিঠি লিখিয়া···

ভবিষ্যৎ

মন বলিল, চিঠি লিখিয়া ডাকিয়া আনিয়াছিল তার কারণ মুকুল ব্যারিষ্টার তখন গিয়াছিল কালিম্পং। প্রাণের সাথী সে···দিনগুলা বিরস লাগিতেছিল, তাই! এখন মুকুল ব্যারিষ্টার আসিয়াছে···

বেদনায় মন ভাঙ্গিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল! কোনোমতে মনকে সবল করিয়া তুলিয়া আদিত্য ভাবিল—মুকুলের প্রসঙ্গে জাহ্নবী সেদিন বলিয়াছিল মুকুলের মাকে গিরিবালা বলিয়াছিলেন আদিত্যর সঙ্গে জাহ্নবীর বিবাহের ব্যবস্থা পাকা এবং সে কথা বলিতে জাহ্নবীর কণ্ঠ এতটুকু কাঁপে নাই! তার চোখের দৃষ্টিতে বিরাগের বাষ্প দেখে নাই! তবে···

কিন্তু প্রত্যক্ষ যা ঘটিতে লাগিল···

অর্থাৎ আদিত্য সকালে চা খাইয়া হিল-ভিউ হইতে এ-বাড়ীতে আসে। আসিয়া দেখে, মুকুল বেশ পাড়ি জমাইয়া বসিয়াছে! সীতা সঙ্গে থাকে···সে যেন সেই কাব্যের পাদপূরণের জন্য চবৈতুহির মতো! আসিয়া কোনোদিন আদিত্য দেখে, মুকুল বসিয়া জাহ্নবীর সঙ্গে লুডো খেলিতেছে···কোনোদিন স্নেক্স্ এ্যাণ্ড ল্যাডার্স···কোনোদিন ক্যারম্, কোনোদিন বা ব্যাগাটেল! খুব সকালেও আসিয়া দেখিয়াছে, এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম নাই! আদিত্য আসে, বসিয়া খেলা দেখে, চা খায়···চলিয়া যায়! খেলায় জাহ্নবী এমন মাতিয়া থাকে যে, তার পানে চাহিয়া তার সঙ্গে দুটো কথা কহিবে, তাও খেয়াল থাকে না।

হিল-ভিউয়ে ফিরিয়া আদিত্য ভাবে, গল্পে উপন্যাসে নায়ককে এমন

অবস্থায় ফেলিতে সে কাতর হয় নাই···তাই কি সেই সব কাল্পনিক নায়কের অভিশাপে জীবন্ত তার ভাগ্যে···

হঠাৎ সেদিন সকালে আসিয়া আদিত্য বলিল—আজ আমি চলে যাচ্ছি···

লুডো খেলায় একটু আগে জাহ্নবীর হ'দুটো ঘুঁটি মুকুল কাটিয়া দিয়াছে···ডাইস্ লইয়া নানা কশরতি করিয়াও জাহ্নবীর হাতে ছয়ের দান পড়িতেছে না···মুকুল ওদিকে ছয়ের পর ছয় ফেলিয়া ঘুঁটিগুলাকে পাকাইয়া তুলিতেছে···জাহ্নবীর ধরা-মাথা ঝন্‌ঝন্ করিতেছে···তার মধ্যে আদিত্যর মুখে এই কথা বিনির্গত হইল।

কথাটা জাহ্নবীর কাণে গেলেও মনের দ্বার খোলা পাইল কি না কে জানে! সে শুধু বলিল—ও···

আর কোনো কথা নয়! জাহ্নবীর দান পড়িল ছয়···সোল্লাসে লাল ঘুঁটি ঘরে বসাইয়া জাহ্নবী ডাইসের খোলে ডাইসটিকে সবেগে নাড়া দিতে লাগিল।

আদিত্যর বুকের মধ্যে ঝড়-বিদ্যুৎ গর্জ্জিয়া উঠিল। সে ঝড়ে, সে বিদ্যুতের আগুনে বুকের ভিতরটা ছিঁড়িয়া পুড়িয়া বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটিবার জো!

সেই ঝড়-বিদ্যুৎ বুকে বহিয়া আদিত্য চলিয়া আসিল।···পথে খানিকটা চলিয়াছে, সহসা মাথায় ক্যাপ, গলায় কম্ফর্টার আঁটা, ভারী পুরাণো অলেষ্টার গায়ে এক ভদ্রলোক হঠাৎ ডাকিল—শুনছেন?

আদিত্য ফিরিল।···লোকটা চেহারায়···যাকে বলে ভ্যাগাবণ্ড টাইপ!

ভবিষ্যৎ

আদিত্য বলিল—আমাকে বলছেন?

লোকটি বলিল—হ্যাঁ। আপনার বাড়ী না শিলিগুড়িতে?

বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া আদিত্য বলিল—হ্যাঁ। কিন্তু…

—না, তাই বলছি…বলিয়া লোকটা হঠাৎ পিছন ফিরিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

আদিত্য যেন কাঠ! চকিতের জন্য! ভাবিল, কে ও লোক? সহসা অমন ঘাড়ে পড়িয়া বলিল শিলিগুড়ি…তারপর আর কথা নাই… উত্তরের জন্য তেমন আগ্রহ নাই…কর্পূরের মতো উবিয়া গেল!

আদিত্য হতভম্ব! দাঁড়াইয়া অতীত স্মৃতির গহনে সন্ধান করিল,—এ চেহারার লোক…

না! মনে পড়ে না।

হিল-ভিউয়ে আসিয়া আদিত্য ম্যানেজারকে বলিল—আজকের মেলে আমি কলকাতা যাচ্ছি। আমার হিসেবটা…

বলিয়া ঘরে আসিয়া টাইম-টেবিল পাড়িয়া বসিল। মনের মধ্যে হাজার হাজার চিন্তা সরীসৃপের মতো কিলবিল করিতে লাগিল।

জাহ্নবীকে বলিয়া আসিয়াছে, আজ কলিকাতায় যাইতেছে! ভাবিয়াছিল, সে-কথায় খেলার মাতন ভুলিয়া জাহ্নবী তার পানে চাহিবে, ম্লান ছল-ছল দুটি চোখ…মলিন মুখ! না হয় চোখের কোণে অভি-শাপের মৃদু অগ্নিশিখা…

লুডোর ছক ফেলিয়া মুকুলকে ভুলিয়া আদিত্যর হাত ধরিয়া পাশের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইবে!…

অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস হইলে এমন অবস্থায় আদিত্য যেমন লিখিত!

কিন্তু জাহ্নবীর দিক হইতে সে-সবের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই! তবে কি…

অথচ এমন সঙ্গীন অবস্থায় আদিত্য যদি কলিকাতায় চলিয়া যায়, মুকুল যে-রকম জাঁকাইয়া বসিয়াছে, কে জানে দুম্ করিয়া সে হয়তো জাহ্নবীর হৃদয়-দুর্গ অধিকার করিয়া বসিবে!

মাথায় যেন আগুন জ্বলিতেছিল! খোলা জানলা দিয়া আদিত্য চাহিল বাহিরের পানে। নীচে পাইন-ঝাড়ের আড়ালে কতকগুলো বাঙলো বাড়ী…মনে হইল, ওগুলা তার মনের আগুনে যেন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে!

বেলা বারোটা…দ্বারের বাহিরে তরুণীর কলকণ্ঠ! আদিত্য চমকিয়া উঠিল! জাহ্নবী আসিয়াছে তবে…

যে বুক বেদনার ভারে দশ হাত নামিয়া গিয়াছিল সে বুক চকিতে খাড়া হইল! উদগ্র হৃদয়ে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল…পর্দ্দা ঠেলিয়া এখনি জাহ্নবী আসিয়া সে ঘরে ঢুকিবে! ঢুকিয়া…

জাহ্নবী আসিল না! বুকখানা ধরাশ করিয়া পাতালের অতল-তলে নামিয়া গেল। থিয়েটারে দেখিয়াছিল সীতার পাতাল-প্রবেশ…সেই পাতাল-প্রবেশিনী সীতার মতো!

আহারাদি সারিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিল না। বাহির হইবে, হোটেলের বয় আসিয়া ম্যানেজারের বিল দিল। আদিত্য বলিল—না, কলকাতায় যাওয়া হলো না।

বলিয়া বিলখানি বয়ের হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া আদিত্য পথে বাহির হইল।

এখানে-ওখানে ঘুরিল—সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীন ভাবে। কতবার মনে হইল, চিন্তাহরণের গৃহে গিয়া উদয় হইবে। পা দু'খানা কে যেন চাপিয়া ধরিল। মন বলিল, না, গিয়া হয়তো দেখিবে···মুকুলের সঙ্গে মহা-উল্লাসে জাহ্নবী লুডো খেলিতেছে!

মুকুলের উপর রাগ হইল। ছিল কালিম্পঙে···সহসা আবার দার্জ্জিলিংয়ে আসিয়া উদয় হইল কেন? নিশ্চয় অভিসন্ধি আছে···বিবাহের দিন আসন্ন হইতেছে, তাই যেমন করিয়া পারে···

ভাবিল, পথে পথে ঘোরা নয়···হোটেলে ফিরিয়া একটা গল্প লিখিবে! তরুণ ব্যারিষ্টারদের নির্লজ্জ লোলুপতাকে কেন্দ্র করিয়া খুব একটা তীব্র স্যাটায়ার···সে স্যাটায়ার পড়িয়া মুকুল···

হিল-ভিউয়ে ফিরিল। বেলা তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে।

ম্যানেজার বলিল—একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন আপনার সন্ধান করতে!

চিন্তাহরণ? না, মুকুল?

আদিত্য বলিল—কার্ড রেখে গেছেন?

ম্যানেজার বলিল—না।

—নাম বলে গেছেন?

—না।

—তবে?

ম্যানেজার বলিল—আপনি কবে এসেছেন...কত দিন থাকবেন ··· আসার উদ্দেশ্য···এই সব জিজ্ঞাসা করছিলেন !

আদিত্য বলিল—আপনি কি জবাব দিলেন ?

ম্যানেজার বলিল—আমি বললুম বেড়াতে এসেছেন এখানে !

—হুঁ !···আর কোনো কথা ?

ম্যানেজার বলিল—কে বন্ধু-বান্ধব এখানে আসেন-যান, জিজ্ঞাসা করলেন ! আমি বললুম, চিন্তাহরণ বাবুর মেয়ে আসেন-যান···তাঁর সঙ্গে বিবাহ হবে।···

আদিত্য ভ্রূ কুঞ্চিত করিল...কে ? বলিল—ভদ্রলোকটির চেহারা কি রকম, বলুন তো ?

ম্যানেজার বর্ণনা দিল। সে বর্ণনা শুনিবামাত্র আদিত্যর মনে জাগিল পথে চকিতে দেখা সেই জীর্ণ আলুষ্টার-পরা মূর্ত্তি ! চিন্তাহরণের গৃহ হইতে বাহিরে আসিলে পথে যে লোক সেই শিলিগুড়ির উল্লেখ করিয়াছিল !

মনে অস্বস্তি জাগিল ! কে এ-লোক ? আদিত্যর সম্বন্ধে সহসা তার এ কৌতূহল কেন ?

ভক্ত ? তার লেখা পড়িয়া মশগুল্·· তাই আসিয়া আলাপ করিতে চায় ?

কিন্তু প্রথম-দর্শনে প্রথম ছোট্ট কথাটুকু···তাহাতে ভক্তির বিন্দু-আভাস জাগে নাই তো !···

আদিত্য বলিল—আবার আসবে কি না বলে গেছে ?

ম্যানেজার বলিল—না···তেমন কোনো কথা বলে যান নি !

বুকে একরাশ প্রশ্ন বহিয়া আদিত্য ঢুকিল নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, বই কাগজ-পত্র বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো! বেশ মনে পড়ে, বই-খাতাপত্র গুছানো ছিল। সে ডাকিল—বয়···

বয় আসিল।

আদিত্য বলিল—কে এ-সব ঘেঁটেছে?

বয় বলিল—একটি বাবু এসেছিলেন। এ ঘরে বসেছিলেন···তিনিই কাগজপত্র দেখছিলেন।

আদিত্য ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল,—ঘর খোলা ছিল?

বয় বলিল—আমাকে বললেন ঘরের চাবি খুলে দিতে। বললেন, আপনার আত্মীয়···দেখা করতে এসেছেন। তাই···

আত্মীয়!···মন গর্জ্জন তুলিল, কহিল—কেউ নয়!···

আদিত্য চাহিল বয়ের পানে, বলিল—আমি না থাকলে···এবার থেকে যে-কোনো লোকই আসুক···আমার নিকট-আত্মীয় বলে পরিচয় দিলেও খবর্দ্দার ঘর খুলে বসতে দেবে না!

বয় বলিল—জী।

তারপর বয়ের নিষ্ক্রামণ!

আদিত্য কাগজ-পত্র হাতড়াইতে লাগিল, কোনো বই বা লেখা-খাতা খোয়া গেল কিনা···

না। খাতা-বই সব ঠিক আছে···শুধু একখানা ফটোগ্রাফ পাওয়া যাইতেছে না! আদিত্যর ফটো...'সৎনাম' পত্রিকা তার ফটো তুলিয়াছিল—সৎনাম-কাগজে ছাপিবার জন্য···সেই ফটো!

সে-ফটো কাল রাত্রেও সে দেখিয়াছে। ঠিক করিয়াছিল, দার্জ্জিলিং

হইতে ফিরিবার সময় ফটোখানির নীচে বেশ লাগসই ক'টি কথা লিখিয়া জাহ্নবীকে উপহার দিয়া যাইবে! আশ্চর্য্য! সে-ফটোগ্রাফে এ-লোকটার কি কাজ!...

সন্ধ্যার একটু আগে অবসন্ন দেহ-মন লইয়া বারান্দায় ইজিচেয়ারে পড়িয়াছিল...চোখ বুজিয়া গল্পের প্লট ভাবিতেছিল—মুকুল ব্যারিষ্টারকে কেন্দ্র করিয়া সেই প্লাশিং স্যাটায়ার...হঠাৎ আবেশ ভাঙ্গিল মুকুলের কণ্ঠস্বরে!

মুকুল বলিল—এই যে মশায়...আছেন! জাহ্নবী...

চোখ খুলিয়া আদিত্য ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে, সামনে মুকুল ...আর তার পিছনে বারান্দায় আসিয়া উঠিল জাহ্নবী এবং সীতা!

জাহ্নবী বলিল—আপনার হয়েছে কি? অসুখ?

আদিত্য বলিল—না।

জাহ্নবী বলিল—তবে আমাদের ওখানে যাননি যে...সারা দিন?

মন বলিল, ফোঁশ করিয়া দাও একটি ছোবল্! কিন্তু অভিমান বা রোষের বিন্দুবাষ্পও মুখে বাহির হইল না। সে বলিল—কাজ করছিলুম!

জাহ্নবী বলিল—কি কাজ?

আদিত্য বলিল—গল্প লিখবো তারি প্লট ভাবছিলুম!

সীতা আগাইয়া আসিল তার দু'চোখে বিমুগ্ধ ভাব...

সীতা বলিল—বলুন আদিত্য বাবু...লেখার আগেই সে গল্প শুনবো। আপনার সঙ্গে এত জানাশোনা, তার মস্ত বড় প্রিভিলেজ্...এর পর পাঁচ জনের কাছে অহঙ্কার করে' বলতে পারবো যে, লেখবার আগে ও-গল্প আমাদের আপনি শুনিয়েছেন!

আদিত্য মৃদু হাস্য করিল...কোনো জবাব দিল না।

জাহ্নবী বলিল—পায়ের ব্যথা কম···রিকৃশ করে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলুম। আমি একা রিকৃশয়, ওঁরা দু'জনে অবশ্য হেঁটে···বেড়াতে বেড়াতে মুকুলবাবু বললেন, আদিত্যবাবুর হোটেলে গিয়ে তাঁকে সার্‌-প্রাইজ্ দিলে কেমন হয়? আমি বললুম—চমৎকার! তাই...

হায়রে, জাহ্নবীর আগমনে আগুন নিবিয়া আদিত্যর মনে যে বসন্ত-মাধুরী-বিকাশের আভাস জাগিতেছিল সে মাধুরী নিমেষে ঝরিয়া গেল! আদিত্য যায় নাই, সেজন্য জাহ্নবী তার চিন্তাও করে নাই···মুকুল বলিয়াছে, সারপ্রাইজ্ দিবে তাই আসিয়াছে! মুকুলের কথায় আসা!

উষ্ণত নিশ্বাস কোনোমতে রুদ্ধ করিয়া আদিত্য চাহিল অন্য দিকে। সীতা বলিল—দেখাবেন না আদিত্যবাবু আপনার লেখা খাতা··· আপনার ম্যানুসক্রিপ্ট?

আদিত্য বলিল—কিছু লিখিনি এখানে এসে।

মুকুল বলিল—চায়ের ফরমাশ করুন আদিত্য বাবু...

আদিত্য ডাকিল—বয়···

চা পান শেষ হইল। বিলাতে মুকুল দেখা করিয়াছিল দু'চারিজন ইংরেজ সাহিত্যরথীর সঙ্গে; তাঁদের গল্প বলিল, নানা আলোচনা হইল। তারপর জাহ্নবী বলিল—রাত হলো...আমরা যাই। চলুন মুকুলবাবু···

মুকুল বলিল—হ্যাঁ...

সকলে উঠিল। সীতা বলিল আদিত্যকে—আপনি আসবেন না

বুঝি আমাদের সঙ্গে? আসুন...যে-গল্পের প্লট ভাবছিলেন, যেতে যেতে আমাকে বলতে হবে... আমি ছাড়বো না...আই হ্যাভ্ ক্লেম অন ইউ!

অগত্যা বাহির হইতে হইল।

ক'জনে আসিল চিন্তাহরণের গৃহে।

চিন্তাহরণ সম্মুখে...গম্ভীর মুখ!

আদিত্যকে দেখিবামাত্র যেন ছু'খানা ঘন মেঘে সংঘর্ষ...তখনি বাজের হুঙ্কার!

চিন্তাহরণ কহিলেন—আদিত্য!

সে স্বরে আদিত্য আর নাই! কোনোমতে চিন্তাহরণের পানে চাহিল। চিন্তাহরণ কহিলেন—তুমি এত-বড় স্কাউনড্রেল! গেট্ আউট...ইয়েস্...যাও...আমার বাড়ীতে আর কখনো তুমি আসবে না! নেভার! হুঁ...তোমার সঙ্গে আমি দেবো আমার মেয়ের বিবাহ! নেভার!

বিনামেঘে বজ্রপাত হইলে মানুষ নাকি স্তম্ভিত হয়...সাহিত্যে এমনি একটা কথা পড়িয়াছি! চিন্তাহরণের বজ্রবাক্যে সকলে তেমনি স্তম্ভিত! এবং তাদের সেই স্তম্ভিত ভাবকে আরো বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়া চিন্তাহরণ কহিলেন জাহ্নবীকে উদ্দেশ করিয়া—ওর সঙ্গে মিশবে না···কোনো সম্পর্ক রাখবে না···একটু আগে ওর যে-পরিচয় পেয়েছি ·· রেগুলার ভিলেন!

জাহ্নবীর মুখ বিবর্ণ...চেতনা যেন অবলুপ্ত। মুকুল-সীতা নির্ব্বাক নিস্পন্দ!

চিন্তাহরণ চাহিলেন আদিত্যর পানে, বলিলেন—যাও···সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলিয়া ফটকের দিকে নির্দ্দেশ !

যেন যাদুকরের যাদু···সে যাদুর ঘোরে যন্ত্র-চালিতের মতো আদিত্য চিন্তাহরণের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল ।

বিনামেঘে যেন বজ্রপাত হইয়া গেছে !

চিন্তাহরণের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া মুকুল এবং সীতা নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সীতা চাহিল মুকুলের পানে। মুকুলের চোখের দৃষ্টিতে মৃদু ইঙ্গিত...সে-ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝিতে সীতার বিলম্ব হইল না। দু'জনে তখনি মূক-অভিনেতার মতো রঙ্গস্থল হইতে নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

হুঙ্কার শুনিয়া গিরিবালা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।··· আদিত্যকে তিনি দেখিলেন···পাণ্ডু বিবর্ণ মুখে বেত্রাহতের মতো নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল ।

আদিত্য চোখের আড়ালে অদৃশ্য হইবার পর পাঁচ সাত মিনিট কাটিয়া গেল। তারপর জাহ্নবী কোনো মতে পা দু'টাকে টানিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। চিন্তাহরণ বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গিরিবালা তাঁর কাছে আসিলেন, বলিলেন,—ব্যাপার কি ?

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চিন্তাহরণ চাহিলেন গিরিবালার পানে ; তারপর চারিদিকে। জাহ্নবীকে বারান্দায় দেখিলেন না। নিঃশব্দে তিনি সামনের ইজিচেয়ারে বসিয়া একটা সিগার ধরাইয়া মুখে দিলেন।

গিরিবালা কহিলেন—কাকে অমন করে ধমকালে ?

গম্ভীর কণ্ঠে চিন্তাহরণ কহিলেন—আদিত্যকে।

—ঐ সব কটু কথা বলে তাকে তাড়িয়ে দিলে?

—হ্যাঁ।

—তার পর?

চিন্তাহরণ বাহিরের পানে চাহিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন—তার পর মানে, ওর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ হবে না...হতে পারে না!

গিরিবালা একেবারে কাঠ! তাঁর মুখে কথা সরিল না।

চিন্তাহরণ কহিলেন—ওর আজ যে-পরিচয় পেয়েছি...এত বড় স্কাউণ্ড্রেল!

গিরিবালার বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! তিনি কহিলেন—কি এমন পরিচয়, শুনি?

চিন্তাহরণ চাহিলেন চারিদিকে...তারপর বলিলেন—জাহ্নবীর শোনবার দরকার নেই। তাকে এ সব কথা বলো না যেন!

গিরিবালা বলিলেন—সে বিচার পরে হবে! এখন শুনি কি এমন ওর পরিচয়!

কণ্ঠ মৃদু করিয়া চিন্তাহরণ বলিলেন—ওর কাছে শুনেছো তো, শিলিগুড়িতে ওদের বাড়ী ছিল...বাপের মস্ত কারবার ছিল...দার্জ্জি-লিংয়ে হামেশা আসা-যাওয়া করতো!

এতখানি ভূমিকা গিরিবালার ভালো লাগিল না...এ সব কথা তিনি জানেন! যা জানেন না, তা শুনিতে অধীরতার সীমা নাই। একটু অসহিষ্ণুকণ্ঠে তিনি বলিলেন—হ্যাঁ, সে তো ও নিজেই বলেছে...এর মধ্যে তোমার নতুন আবিষ্কার করবার কিছু দেখছি না তো!

চিন্তাহরণ বলিলেন—হুঁ···দাঁড়াও···অত ব্যস্ত হলে চলবে না।

গিরিবালা বলিলেন—বলো, তোমার যা বলবার আছে।

চিন্তাহরণ বলিলেন—পাঁচ-সাত বছর আগে উনি এসেছিলেন এই দার্জ্জিলিং সহরে। চাঁদমারী মহল্লায় আস্তানা নিয়েছিলেন। সেই চাঁদমারীতে থাকতো একজন আবগারী-দারোগা···তার নাম ছিল মনসা হালদার। মনসা হালদারের এক ভাগনী ছিল···ডাগর বয়স···বিধবা। তার সঙ্গে ওঁর এতখানি অন্তরঙ্গতা হয় যে শেষে বাধ্য হয়ে সেই মেয়েকে বিয়ে করতে হয়েছিল! বৌ নিয়ে চাঁদমারীতে চার বছর ছিলেন···ঐ মনসা হালদারের বাড়ীতেই। ছোট একখানা চায়ের দোকান খুলেছিল। তারপর একটি ছেলে হয়...আর একটি মেয়ে হয়। মনসা হালদারের ওদিকে পেন্সন হয়ে যায়। চায়ের দোকানের আয়ে ওঁর আর ওঁর বৌয়ের আর ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ দুর্ঘট হয়ে ওঠে। মনসা হালদার তখন ওকে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দোসরা বাসা ঠিক করতে বলে। সেই বলার ফলে স্ত্রীকে আর ছেলেমেয়েকে মনসা হালদারের ঘাড়ে চাপিয়ে বাবুজী দেন লম্বা!···এ-মুখো হন্‌নি আর! তাদের খোঁজ-খপরও রাখেননি। এখন সেই মনসা হালদারের ভাইপো দৈবাৎ কবে বুঝি ওঁকে আমার বাড়ী থেকে বেরুতে দেখে! পাছু নিয়ে ওর হোটেলে গিয়ে তল্লাস নেছে! সেখানে বুঝি শুনেছে, আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা, তাই সে ভদ্রলোক এসেছিল আজ আমার কাছে···ওর পরিচয় বলে দিয়ে আমাকে হুঁশিয়ার করতে!···বুঝলে?

বটতলায়-ছাপা উপন্যাসের কাহিনী শুনিলে বিশ্বাস করিতে যেমন প্রবৃত্তি হয় না···অথচ সে গল্পে রস প্রচুর, এ যেন তেমনি; গিরিবালা

কহিলেন—ভদ্রলোক এই গল্প বলে গেল, আর শোনবামাত্র তুমি এ গল্প বিশ্বাস করে ওকে যা-তা মন্দ কথা বলে শেয়াল-কুকুরের মতো বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে!

চিন্তাহরণ বলিলেন—এ কথা শোনবার পরেও তুমি ওকে জামাই-আদরে সম্বর্দ্ধনা করতে বলো!

গিরিবালা বলিলেন—সম্বর্দ্ধনা না করো, তা বলে অপমান করবে! এ গল্প সত্য কি মিথ্যা—তার কোনো সন্ধান না নিয়েই?

চিন্তাহরণ বলিলেন—একেই বলে স্ত্রী-বুদ্ধি!···আহা, বুঝছো না, আদিত্যর উপর ভদ্রলোকের কি এমন জাতক্রোধ থাকতে পারে যে তার জন্য ভদ্রলোক এসে এমন একটা বিশ্রী গল্প বানিয়ে বলবে তার নামে?

গিরিবালা ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন···স্বামীর ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিলেন; তার পর অবিচল শান্ত স্বরেই বলিলেন—জাতক্রোধ আছে কি না, তার খপর নিয়েছো তুমি?

চিন্তাহরণ হুম করিয়া জবাব দিলেন—আমার প্রয়োজন?

রাগে গিরিবালার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল! তিনি বলিলেন—মেয়ের সঙ্গে যার বিয়ের কথা পাকা···দু'দিন পরে বিয়ে হবে, তার নামে অজানা কে এসে এত বড় অপবাদ দিয়ে গেল, আর তুমি সে অপবাদ বিশ্বাস করে ঘাড় ধরে তাকে বিদায় দিলে?

—নিশ্চয়!···আমার এক মেয়ে। সে যার-তার মেয়ে নয়। বড় ঘরে তার বিয়ে দেবার মতো সামর্থ্য আমার আছে। মেয়ে দেখতে ভালো। যার নামে লোকে এ-সব কথা এমন অম্লান মুখে বলতে

পারে—তার সংসর্গ যে ইতর, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না! তবে? কাজ কি আমার ও-গোলমালের মধ্যে গিয়ে! লোকের মুখ তো চাপা দিতে পারবো না! আমি এখন নিখুঁত পাত্র খুঁজে বিয়ে দিতে চাই, যার নামে কেউ একটী কথা বলতে পারবে না!

গিরিবালা বলিলেন—মানুষের মতো কথা এ নয়।...তাছাড়া তোমার মেয়ের সঙ্গে এতদিন এমন ভাবে মেলামেশা করছে...বাড়ীতে জামাইয়ের মতো আদর-যত্ন করছি আমরা...সত্যিই যদি তোমার ঐ ভদ্রলোক যা বলে গেছে, যদি তাইই হয়, তা হলে এমন করে হঠাৎ যে ওকে আজ তাড়িয়ে দিলে...ও যদি তোমার মেয়ের নামে পাঁচটা কথা রটনা করে বেড়ায়, তাহলে কোন্ বোনেদী বড় ঘরে মেয়ের তুমি বিয়ে দেবে, শুনি?

চিন্তাহরণ বলিলেন—আমার মেয়ের নামে যদি কেউ তেমন কিছু গল্প রটায়, লোকে তা বিশ্বাস করবে?

—কেন করবে না? আদিত্যর নামে এ রটনা তুমি যদি বিশ্বাস করো, তাহলে তোমার মেয়ের নামে রটনা লোকে কেন বিশ্বাস করবে না, বলতে পারো?

গিরিবালার কথা চিন্তাহরণের মনকে বেশ একটু খোঁচা দিল। যাহা করিয়াছেন, সে-কাজকে সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া সায় দিয়া মন নিশ্চিন্ত ছিল! এখন গিরিবালার কথায় সে-কাজের চারিদিক ফিরিয়া এত রকমের কলরব!

চিন্তাহরণ বলিলেন—তুমি কি বলতে চাও, শুনি?

গিরিবালা বলিলেন—ভদ্রলোক যে এ-সব কথা বলে গেলেন,

তোমার উচিত তাঁকে ধরে রেখে আদিত্যকে ডাকিয়ে এর মোকাবেলা করানো! তা যদি না করালে, বেশ, আদিত্যকেই তো শান্ত মেজাজে বল্‌তে পারতে যে বাপু এমনি কথা উঠেছে তোমার নামে, এ সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে?...মানুষকে মানুষ চিন্তে ভুল করে, এমনও তো হয়!

গিরিবালার কথায় চিন্তা[illegible] আহত সাপের মতো ফণা গুটাইয়া নির্জীব পড়িয়া ছিল; ক[illegible]ষটুকু শুনিবামাত্র নির্জীব মন আবার ফোঁশ করিয়া ফণা তুলিল।

চিন্তাহরণ বলিলেন—সে নিশ্চয় বলতো, মিথ্যা কথা মশাই!

গিরিবালা বলিলেন—তার মুখ থেকে সে কথা না শুনেই তুমি ডিক্রী-ডিস্‌মিস্‌ করতে চাও?

চিন্তাহরণ বলিলেন—আচ্ছা, আদিত্য যদি সত্যই দোষী হয়...এত-বড় অপকর্ম্ম করে তারপর আমার বাড়ীতে এসে অকুণ্ঠিতভাবে আসা-যাওয়া করতে তার যদি না বেধে থাকে...তার উপর আমার একটি মাত্র মেয়ে...তাকে বিয়ে করে আরামে থাকবার এত-বড় সুযোগ...এ সুযোগ সে ছাড়বে ভাবো? তোমার মেয়েরও যখন এতখানি মন পড়েছে ওর উপর...

এই পর্য্যন্ত বলিয়া চিন্তাহরণ চাহিলেন স্ত্রীর পানে...দুই চোখে বিজয়-উল্লাসের প্রদীপ্ত দৃষ্টি ভরিয়া।

গিরিবালা কোনো কথা বলিলেন না; কি ভাবিতেছিলেন...

তাঁকে নিরুত্তর দেখিয়া চিন্তাহরণের যুক্তি অনেকখানি শক্তি লাভ করিল। চিন্তাহরণ বলিলেন—গোড়া থেকেই আমার এ বিয়েতে আপত্তি!

গোরু-কুকুর কিনতে গেলেও মানুষ দেখে তাদের পেডিগ্রী···বংশ! আর মেয়ের বিয়ে দেবো যার সঙ্গে, তার বংশের পরিচয় নেবো না?

গিরিবালা বলিলেন—এত যদি মানো, এ পরিচয় তোমার অনেক আগে নেওয়া উচিত ছিল। তুমিও তো এ বিয়েতে মত দেছো। তোমার অমতে বিয়ের কথা পাকা হয়নি।

চিন্তাহরণ ঝাঁজিয়া উঠিলেন। বলিলেন—আমার মত তোমরা নিলে কৈ? দায়ে পড়ে আমাকে মত দিতে হয়েছে! তোমার মেয়ে ধরলে গোঁ—তুমিও মেয়ের গোঁয়ে নিজের গোঁ মেশালে! না হলে আমি...আমার একটা পোজিশন আছে সমাজে! এর পর লোকে যখন জিগ্যেস করবে, কার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ হে? তার জবাব কি যে দেবো ছাই, আজ পর্য্যন্ত ভেবে ঠিক করতে পারলুম না!

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া উদাস কণ্ঠে গিরিবালা বলিলেন—খুব অন্যায় কাজ করেছো। কি যে হবে···

উদ্বেগের গভীরতায় গিরিবালার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, তার মুখে হতাশার সুগভীর ছায়া ফুটিল।

চিন্তাহরণ তাহা লক্ষ্য করিলেন; লক্ষ্য করিয়া চিন্তাতুর হইলেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন স্ত্রীর পানে।

গিরিবালা কোনো জবাব দিলেন না। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বারান্দার রেলিঙের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। কাদের বাড়ীতে পিয়োনোয় কে একটা গৎ বাজাইতেছিল...বিলাতী সুর! সুরে বেদনা যেন উছলিয়া পড়িতেছে!

পাঁচ-সাত মিনিট কাটিয়া গেল···কাহারো মুখে কথা নাই। তারপর

সহসা গিরিবালা ফিরিলেন...ফিরিয়া চিন্তাহরণের পানে দৃষ্টির একটা কণাও নিক্ষেপ না করিয়া নিঃশব্দে গিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

ঘরের মধ্যে কৌচে বসিয়া জাহ্নবী নিবিষ্ট মনে ক্রুশ-কাঠিতে পশমের জাম্পার বুনিতেছিল। গিরিবালা তার পানে চাহিয়া সামনের কৌচে বসিলেন; বসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। জাহ্নবী তাঁর পানে চোখ তুলিয়া চাহিল না···নিবিষ্ট মনে জাম্পার বুনিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ এমনিভাবে কাটিল। তারপর গিরিবালা ডাকিলেন—জাহ্নু··

জাহ্নবী স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে মায়ের পানে চাহিল।

গিরিবালা বলিলেন—সব শুনেছিস তুই?···ওঁর কাণ্ড?

জাহ্নবী কোনো জবাব দিল না···মাথা তুলিয়া মায়ের পানে চাহিলও না।

গিরিবালা বলিলেন—এমন কাণ-পাতলা মানুষ···চিরদিন একভাবে কাটলো! মানুষ এসে যদি বলে, কাকে কাণ নিয়ে গেল তো কাণে হাত না দিয়ে কাকের পিছনে ছুটবেন! কেউ যদি এসে বলে, তোমার পরিবার কাকে লুকিয়ে চিঠি লিখেছে···তার কথায় বিশ্বাস করে' স্ত্রীর গর্দ্দানা নেওয়া বিচিত্র নয়! অনাসৃষ্টি আর কাকে বলে?

এত কথাতেও জাহ্নবীর দিক হইতে সাড়া মিলিল না।

গিরিবালা বলিলেন—তোকে সব বলছি মা···খুব অন্যায় কাজ করেছেন উনি। কোথাকার কে এসে কাণে বিষ ঢেলে দিয়ে গেছে... সে-লোকটা যে কি ধাতের, কি তার মতলব...আগে তার খোঁজ নাও ···না, বারুদে আগুন লাগলো!···তোকে যা বলি, করতে হবে। নাহলে বাড়ীর বদনাম হবে মা!

দশ

স্তম্ভিতের মতো আদিত্য ওদিকে সেই যে চিন্তাহরণের গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহির হইল, পথে কোথায় চলিয়াছে, কেন চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে তার যেন কোনো চেতনা ছিল না! চেতনা জাগিল হিল-ভিউয়ের দ্বারে আসিয়া।

চেতনা জাগিবামাত্র মনে হইল, যা ঘটিয়াছে, তা সত্য? না, স্বপ্ন দেখিয়াছে?

স্বপ্ন যে নয়, তাহা বুঝিতে এতটুকু বিলম্ব হইল না! কিন্তু এত বড় অকথা চিন্তাহরণ কেন বলিলেন? চোর-বদমায়েসের মতো এমন করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া! সে কি করিয়াছে…কি এমন দুষ্কৃতি…যার জন্য তাকে স্কাউণ্ড্রেল বলিতে চিন্তাহরণের বাধিল না?

আসিয়া নিজের ঘরে বসিল।…বৈকাল হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, স্মৃতিপথে টানিয়া জড়ো করিল…বিশ্লেষণ করিতে লাগিল…

জাহ্নবী আসিয়াছিল তার গৃহে…সন্ধ্যার ঠিক আগে। একা আসে

নাই···সঙ্গে মুকুল এবং সীতা। জাহ্নবী বলিল, রিকশয় করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। দুপুরে মানুষ বেড়াইতে বাহির হয় না, বাহির হয় বৈকালে! জাহ্নবী তাহা হইলে বৈকালেই বাহির হইয়াছে! বাড়ী হইতে যখন বাহির হইয়াছিল, তখন আদিত্যর উপর চিন্তাহরণের মনোভাব খুব-সম্ভব এমন বিরূপ এবং উগ্র ছিল না!···থাকিলে সে তপ্ত মনোভাবের স্ফুলিঙ্গ জাহ্নবী নিশ্চয় লক্ষ্য করিত! এবং লক্ষ্য করিলে অমন অসঙ্কোচে সে আদিত্যর গৃহে সবান্ধবে আসিয়া উদয় হইতে পারিত না! উদয় হইলেও বাক্যে বা ভঙ্গীতে হয়তো অনুযোগ-অভিযোগ প্রকাশ করিত! তা সে করে নাই। সীতা বা মুকুলের ব্যবহারেও চিন্তাহরণের উগ্রতার আভাস জাগে নাই! সীতা যে সরল সহজ ভঙ্গীতে তার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিল, সে ভঙ্গী হইতে আদিত্যর উপর তার শ্রদ্ধার লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছিল! সুতরাং ..

জাহ্নবী বাহির হইয়া আসিবার পর বাড়ীতে এমন কিছু ঘটিয়া গিয়াছে, যার জন্য চিন্তাহরণ রাগে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন! তার সঙ্গে জাহ্নবীর বিবাহ দিতে চিন্তাহরণের ইচ্ছা ছিল না, এ-কথা আদিত্য জানে এবং অতীতে তাঁর এ অনিচ্ছা কোনো দিন এতটুকু রূঢ় ভাবে তাকে আঘাত করে নাই!

হঠাৎ কি এমন ঘটিয়াছে যে···

ভাবিয়া কুল-কিনারা পাইল না। মাথার মধ্যে যেন হাজার হাজার মশাল জ্বলিতেছে···মশালের সে আগুনে প্রচণ্ড দাহ!

বয় আসিয়া বলিল—খানা...

নিশ্বাস ফেলিয়া আদিত্য বলিল—খানার দরকার নেই।

বয় বিদায় লইল।

ড্রয়িং-রুমে রেডিয়োয় বাজিতেছিল বিলাতী অর্কেষ্ট্রা···উন্মাদনার সুর! সে সুর অসহ্য বোধ হইল! অথচ উপায় নাই!

আদিত্য একখানা বই খুলিয়া বসিল। একটা লাইন পড়িতে পারিল না। পাগলের মতো মন কোথায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে···সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন···লক্ষ্যহীন!···

কত দিক দিয়া কত কথা সে ভাবিতে লাগিল···কিন্তু কোনো কথাই মনের উপর বসিতে পারে না! মন যেন সেই রুদ্র ভৈরবের মতো সব কথা, সব চিন্তাকে আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া দূরে ঠেলিয়া দেয়! মনে পড়িল রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের সেই পাগলা ফকিরকে···আদিত্যর মনও আজ সেই পাগলা ফকিরের মতো সব-কিছুকে 'ঝুটা হ্যায়' বলিয়া ধূলার মতো উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে!

মাথায় যেন বোলতার চাক! হাজার হাজার বোলতার দংশনে যাতনার সীমা নাই! জর্জ্জরিত অবসন্ন দেহ-মন লইয়া আদিত্য নিরুপায়ে শয্যায় আশ্রয় লইল। নিদ্রার করুণা···নিদ্রা আসিয়া যদি স্নিগ্ধ কর-স্পর্শে সব যাতনা মুছাইয়া দেয়!

সারা রাত্রি নিশ্চেতনের মতো নিদ্রায় কাটিল। এমন ঘুম আদিত্য বহুকাল ঘুমায় নাই!

ঘুম ভাঙ্গিল সকালে দ্বারে সবল করাঘাতের শব্দে। উঠিয়া দ্বার খুলিয়া আদিত্য দেখে, সেই গলায় কম্ফর্টার জড়ানো, গায়ে ওভারকোট চড়ানো মূর্ত্তি···সঙ্গে একজন নেপালী দাই। দাইয়ের কোলে একটি শিশু-কন্যা এবং দাইয়ের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে

ভবিষ্যৎ

ভীরু চোখে শীর্ণ-মূর্ত্তি একটি বালক। বালকের বয়স তিন চার বছর।

লোকটার স্পর্দ্ধা দেখিয়া আদিত্য রাগে জ্বলিয়া উঠিল! আলাপ নাই, পরিচয় নাই···সকালে আসিয়া ভদ্রলোকের দ্বারে হল্লা করে!

চোখে এবং কণ্ঠে বিরক্তি ভরিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আদিত্য বলিল —কি চাই?

শ্লেষ-বিজড়িত কণ্ঠে সে বলিল—মশাইকে চাই!

বিরক্তি ছাপাইয়া বিস্ময় বাড়িল! সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, এই লোকটাই না তার ফটোগ্রাফ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে?

আদিত্য বলিল—এ-সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে মানুষ দেখা করতে আসে না!

লোকটা বলিল—ভদ্রলোক যদি সব সময়ে বাসা থেকে গা ঢেকে বাইরে ঘুরতে থাকে?

দু'চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল! আদিত্যর মনে হইল, মারিব না কি লোকটার মুখে জোর-ঘুষি?···কোনোমতে মনের রাগ মনে চাপিয়া বলিল—আমাকে কি দরকার চট্‌পট্ বলে' বিদায় নিন্। আপনার সঙ্গে বসে আলাপ করবো, সে অবসর আমার নেই।

লোকটা তখন দাইয়ের হাতের গ্রাস হইতে ছোট ছেলেটিকে টানিয়া আনিয়া বলিল—এ ছেলেটিকে চেনেন?

বালকের পানে চাহিয়া আদিত্য চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই; এখন করিল। বালকের মুখখানা যেন পরিচিত···ও মুখে যেন···

বিস্ময় এবং প্রশ্নভরা কণ্ঠে আদিত্য বলিল—না।

লোকটা অবিচল নেত্রে আদিত্যর পানে চাহিয়া রহিল; তারপর বলিল—মনসা হালদারকেও বোধ হয় মনে নেই?

মনসা হালদার!…বাস্তব জগতে যতগুলি লোক ছিল পরিচিত, তাদের মধ্যে মন একবার দ্রুতগতিতে ঘুরিয়া সন্ধান লইল…না, মনসা হালদার নামটার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না! উপন্যাস এবং নাট্যজগতে সন্ধান লইল। যেমন নাম, নিশ্চয় কল্পলোকের কোনো টাইপ-ক্যারেক্টার! কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ হইতে আধুনিক যুগের গল্প-উপন্যাস যা কিছু পড়িয়াছে, সেগুলার পুরুষ-চরিত্রগুলা চোখের সামনে দিয়া বায়োস্কোপের ছবির মতো উদয় হইয়া ছায়ায় মিলাইয়া গেল… তাদের মধ্যেও মনসা হালদারের সন্ধান মিলিল না!…তবে কি দীনবন্ধুর সেই নাটকে…গায়ে গুড় মাখিয়া সেই গুড়ের উপর তুলার পাঁজ আঁটা? মন বলিল, না, সে তো নবীন তপস্বিনীর জলধর!

আদিত্য বলিল—না মশাই, মনসা হালদারের নাম জীবনে কখনো শুনিনি।

লোকটার নির্নিমেষ দৃষ্টি আদিত্যের মুখ হইতে সরিতে চায় না! আদিত্যর উত্তর শুনিয়া লোকটি বলিল,—এখন না শোনাই সম্ভব! কিন্তু পাঁচ বছর আগে…এই মনসা হালদারের আশ্রয়ে দিব্যি সংসার পেতে বসেছিলেন! তার বিধবা-ভগ্নীকে বিবাহ করে…জামাই-আদরে বাস!

অসহ্য! সকালে উঠিয়া এমন ইতর আলাপ! আদিত্য বলিল,—পাগলামি করবার জায়গা পাননি ব্যাট! যান্ চলে। সাহায্য-টাহায্য

কিছু মিলবে না! ধাপ্পাবাজি করে ভিক্ষা আদায় করবে আমার কাছ থেকে, সে পাত্রই আমি নই!

লোকটা বলিল—ভিক্ষে করা আমার চোদ্দপুরুষের স্বভাব নয়। সে বরং বোনেদী ঘরের বাচ্ছা বলে পরিচয় দিয়ে মশাইয়ের শুধু…

—খবর্দ্দার! বলিয়া দু'চোখ রক্তবর্ণ করিয়া আদিত্য গর্জ্জিয়া উঠিল! বলিল,—বেরিয়ে যাও! যাও, বলছি…নাহলে বেয়ারা দিয়ে এখনি…

বাধা দিয়া সে বলিল—বেরিয়েই যাবো! এখানে আমি থাকতে আসিনি…তবে আপনার এ দুটি বাচ্ছাকে এখানে রেখে তার পর বেরিয়ে যাবো!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া লোকটা চাহিল সঙ্গের সেই নেপালী দাইয়ের দিকে। চাহিয়া তাকে বলিল হিন্দী ভাষায়—মেয়েটাকে বিছানায় শুইয়ে ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে তুই চলে আয়! যার জিনিষ, সে দেখবে। আমাদের কি দায়! হুঁ!

তার কথায় সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে কোলের সেই শিশু-কন্যাকে লইয়া দাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। নিরুপায় আক্রোশে দাঁড়াইয়া আদিত্য এ দৃশ্য দেখিল…নিস্পন্দ নির্ব্বাক! মাথার মধ্যে একরাশ চর্কী-বাজিতে কে যেন আগুন দিয়াছে…আগুনের একরাশ চাকা যেন সবেগে ঘুরিতেছে!

স্ত্রীলোক এবং শিশুর গায়ে হাত দেওয়া যায় না…

শিশুকে বিছানায় শোয়াইয়া দাই বাহির হইয়া গেল। সে বাহিরে গেলে সার্থকতার আনন্দে দু'চোখের দৃষ্টি ভরিয়া লোকটা বলিল—

ভবিষ্যৎ

আমার নাম কালি হালদার। মনসা হালদারের ভাইপো আমি। এখানকার ডিষ্টিলারীতে কাজ করি। আমার পিসতুতো বোনকে বিবাহ করে ছেলেমেয়ে-শুদ্ধ তাকে ত্যাগ করে ক'বছর নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন! ভেবেছিলেন, এর মধ্যে বংশলোপ হয়ে এ-ব্যাটাদের সব সাফ হয়ে গেছে, তাই আবার এখানে এসে উদয় হয়েছেন! দৈবাৎ পথে দেখা। বাড়ীতে ফটো আছে তো···তাই থেকে মশাইকে পথে সেদিন চিনতে দেরী হয়নি...বুঝলেন!

এইখানে কথা থামাইয়া ছোট ছেলেটাকে আদিত্যর দিকে ঠেলিয়া সে আবার বলিল—যা রে বুনো, বাপের কাছে যা। আমার···বলে নিজের জোটে না দু'বেলা পেট পুরে খেতে, তার উপর কে পিসতুতো বোন! গোদের উপর বিষফোড়া···সেই পিসতুতো বোনের দু' দুটো ছেলেমেয়ে!···নিন্ মশাই, ছেলেমেয়ে নিন্। এদের মাকেও পাঠিয়ে দেবো। মানে, আমার রাজু দিদিকে। চলে আয়, দাই।

কথা শেষ করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া কালি হালদার বীর-পদভরে গমনোদ্যত হইল; দাই তার বোঝা নামাইতে তিলমাত্র বিলম্ব করে নাই, পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছে।

কালি হালদারকে গমনোদ্যত দেখিয়া আদিত্য বলিল—আপনি ভুল করেছেন মশাই! আমি সত্যি মনসা হালদার বা আপনার ঐ রাজু দিদিকে চিনি না।

তার দিকে না ফিরিয়াই শ্লেষ-মিশ্রিত উচ্চ হাস্যে বারান্দা প্রকম্পিত করিয়া কালি হালদার প্রস্থান করিল। আদিত্য মন্ত্র-স্তম্ভিতের মতো তার পানে চাহিয়া রহিল—নির্বাক্···নিস্পন্দ!

স্বপ্নো নু মায়া মতিভ্রমো নু !···ঠিক যেন তাই।

চকিতে সম্বিত ফিরিল দুটি নিরীহ শিশুর ক্রন্দনে ! আদিত্য চাহিয়া দেখে, দুজনে তার-স্বরে কান্না জুড়িয়া দিয়াছে।

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিল···ডিষ্টিলারিতে কাজ করে ? নাম, কালি হালদার ! কিন্তু এখন ইহাদের এ-ক্রন্দন...যার বোঝাই হোক, নিরীহ নিরপরাধ শিশু !

আদিত্য আসিয়া তাদের ভুলাইতে বসিল। ভুলিতে কি তারা চায় ? আদিত্য ডাকিল—বয়···

বয় আসিল।

আদিত্য বলিল···খাবার আনো···চকোলেট···বিস্কুট।

বয় চকোলেট-বিস্কুট আনিয়া দিল। খাটে দু'জনকে বসাইয়া তাদের পাশে বসিয়া আদিত্য সেগুলা দিল দু'জনের মুঠা ভরিয়া। মুখে বিস্কুট দিতে কান্না থামিল।

আদিত্য ভাবিল, এখন এ-বিপদ হইতে মুক্তি মেলে কি করিয়া ? চিন্তায় মন সমাচ্ছন্ন···এমন সময়ে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল জাহ্নবী···যেন মলিন ছায়া ! মুখে হাসির যে-দীপ্তি বিরাজ করিত, কালো মেঘ মুখে নামিয়া সে-দীপ্তি যেন মুছিয়া দিয়াছে !

জাহ্নবী ডাকিল—আদিত্য বাবু···

আদিত্য চাহিল তার পানে। জাহ্নবী বলিল—ও···না, থাক্···

কথার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-চমকের মতো জাহ্নবী চকিতে চোখের আড়ালে মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

এগারো

বিনামেঘে অকস্মাৎ বজ্রনাদ শুনিলে মানুষ যেমন প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া যায় মনের গতিস্পন্দন যেমন সংরুদ্ধ হয়, জাহ্নবীর আকস্মিক আবির্ভাব-তিরোভাবে আদিত্যের অবস্থাও ঠিক তেমনি হইল। দারুণ ঘূর্ণীচক্রে বিপর্য্যস্ত সে-মনকে কোনোমতে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে সে যখন হিম্‌সিম্ খাইতেছে, ঠিক তাহারি মধ্যে···

আদিত্য ক্ষণকাল নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল...সমস্ত পৃথিবী যেন চকিতে কোথায় সরিয়া গিয়াছে···সগু-চোখের সামনে সগু যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা সত্য···না, স্বপ্ন···না, সবটাই তার মতিভ্রম···কিছুই যেন নির্ণয় করিতে পারিল না···

তারপর চোখ পড়িল এই দুটি অসহায় শিশুর পানে···কান্না থামাইয়া তারা তখন চকোলেট মুখে পুরিয়াছে...মুখে গালে চকোলেট মাখিয়াছে ···দুই হাতেও তাই...মন তখন সবলে যেন নড়িয়া উঠিল। আদিত্যের সম্বিৎ ফিরিল।

সম্বিত ফিরিবামাত্র আদিত্য ছুটিয়া বাহিরে আসিল...

ঐ চলিয়াছে জাহ্নবী...সঙ্গে মুকুল...

বুকে যেন কে দুরমুস্ করিয়া পাথর ভাঙ্গিতেছে...অসহ্য তার যাতনা। সেই যাতনা বুকে লইয়া আদিত্য ছুটিল জাহ্নবীর পিছনে।

জাহ্নবী আর মুকুল হাঁটিয়া চলিয়াছে...গতি তেমন দ্রুত নয়...

আদিত্য তাদের ধরিয়া ফেলিল। পিছন হইতে ডাকিল—জাহ্নবী...

জাহ্নবী সাড়া দিল না...ফিরিয়া চাহিল না...যেমন চলিতেছিল, তেমনি...সঙ্গী মুকুলও তাই!

আদিত্য ছাড়িবার পাত্র নয়...তার যেন ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা চলিয়াছে!

সে আগাইয়া আসিয়া আবার ডাকিল—শোনো জাহ্নবী...

এবারও জাহ্নবী ফিরিল না...দাঁড়াইল না...চলিতে লাগিল।

আদিত্য তখন ছুটিয়া তাদের সামনে গিয়া দাঁড়াইল...দু'জনেরই গতি রুদ্ধ করিয়া।

জাহ্নবীকে দাঁড়াইতে হইল। দাঁড়াইয়া সে চাহিল আদিত্যর পানে।

আদিত্য দেখিল, জাহ্নবীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে...অসম্ভব-রকমের রাঙা। রাগ করিলে কিম্বা কাঁদিলে যেমন হয়, তেমনি ভাব।

আদিত্য বলিল—এসেই চলে যাচ্ছো যে!

জাহ্নবী বলিল—এসে ভুল করেছি...বুঝলাম। তাই...

জাহ্নবীর কণ্ঠ করুণ।

আদিত্য বলিল—কেন এসেছিলে বলবে না।

জাহ্নবী বলিল—জানবার দরকার আর নেই।

স্বরে শুধু বিরাগ নয়···যেন অনেকখানি অভিমান!

আদিত্য বুঝিল···ঐ কালি হালদার স্কাউণ্ড্রেল নিশ্চয় এমন কল-কাঠি টিপিয়াছে, তার জন্য তবু সে ছাড়িল না. বলিল—কিন্তু আমার জানবার অধিকার আছে, নিশ্চয়!···আমারো কিছু বলবার থাকতে পারে, জাহ্নবী...

জাহ্নবী বলিল—কি সম্বন্ধে?

আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল ..মনের মধ্যে একরাশ চিন্তা... সেগুলাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া তার পর আদিত্য বলিল—কাল তোমাদের বাড়ী যাবামাত্র তোমার বাবা কুকুরের মতো আমাকে তাড়িয়ে দিলেন ···তারপর আজ তুমি এসে ঘরে পা দেবামাত্র ছিট্‌কে যেন বেরিয়ে এলে···এ-সবের নিশ্চয় কোনো কারণ আছে! কাল সন্ধ্যার আগে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করেছো···তারপর কি যে হলো···

তার কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই···জাহ্নবী চাহিল মুকুলের পানে··· মুকুলও একাগ্র মনে আদিত্যর কথা শুনিতেছিল···এবং আদিত্যর কথার উপরেই মুকুল দিল জবাব···যেন জাহ্নবীর দৃষ্টিতে কি ইঙ্গিত ছিল!

মুকুল বলিল—খুব স্পষ্ট করে সব কথা বলা হয়তো চলে না, আদিত্য বাবু···তবে এটুকু আপনি বুঝছেন নিশ্চয় যে কাল বিকেল পর্য্যন্ত চিন্তাহরণ বাবুর মনোভাব আপনার উপর একটুকুও তিক্ত ছিল না··· আপনাকে কাল সন্ধ্যাবেলায় তিনি যে অমন সব কড়া কথা বলেছিলেন

…তাতে মনে হয়…বিকেলে আমাদের ও-বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার পর ও-বাড়ীতে এমন বিশেষ ঘটনা ঘটেছে, যার জন্য সন্ধ্যার পরেই তিনি আপনার ওপর অতখানি অপ্রসন্ন ছিলেন…আর…কিন্তু আমি বাইরের লোক…আমার পক্ষে এর বেশী আর কিছু বলা…হয়তো আপনি মনে করবেন ইমপার্টিনেন্স !

আদিত্য এ-কথা শুনিল…তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমারো তাই ধারণা…কিন্তু আমি শুধু বুঝতে পারছি না…সন্ধ্যার আগে এমন কি ঘটলো…

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দু'চোখে প্রশ্ন ভরিয়া আদিত্য চাহিল প্রথমে মুকুলের পানে…তারপর জাহ্নবীর পানে।

জাহ্নবী চাহিয়াছিল পাহাড়ের গায়ে ঐ একটা পাইন মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে…আকাশের দিকে…তাহারি পানে…দৃষ্টি উদাস।

মুকুল জবাব দিল না।

আদিত্য চাহিল জাহ্নবীর পানে, বলিল—চিন্তাহরণ বাবুর অতখানি বিরক্তির পরেও তুমি আজ সকালে কেন এসেছিলে আমার কাছে, জাহ্নবী…

কথা শেষ হইল না…

জাহ্নবী চাহিল মুকুলের দিকে...সে-দৃষ্টিতে ইঙ্গিত !

মুকুল তাহা বুঝিল...বলিল—কথাটা তাহলে আমাকে বলতে হলো অপ্রিয় কথা…তবু সে অপ্রিয় কথা বলার প্রয়োজন আছে…

আদিত্যর মাথার মধ্যে রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। আদিত্য বলিল—বলুন, যত অপ্রিয় কথাই হোক, আমি শুনবো...শোনা দরকার।

মুকুল বলিল—কাল বিকেলে আমরা বেরিয়ে আসবার পর একটি ভদ্রলোক গিয়ে দেখা করেছিলেন চিন্তাহরণ বাবুর সঙ্গে। চিন্তাহরণ বাবুকে তিনি গিয়ে বলেছেন, আপনি নাকি পাঁচ বছর আগে একবার দার্জ্জিলিংয়ে এসেছিলেন...এসে তাঁর এক বিধবা ভগ্নিকে বিবাহ করেন··· সে বিবাহে আপনার একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হয়, তারপর তাদের ভার সে-ভদ্রলোকের ঘাড়ে চাপিয়ে আপনি হন্ নিরুদ্দেশ!···সে-ভদ্রলোক ক'দিন আগে আপনাকে হঠাৎ এখানে দেখেন পথে... আপনাকে 'ফলো' করে তিনি ক'দিন ধরে আপনার নাম ধাম পরিচয় প্রভৃতির সন্ধান নেছেন। তায়পর...

আদিত্যর মুখ বিবর্ণ.. কোনোমতে স্খলিত কণ্ঠে আদিত্য বলিল—এ-সব কথা সম্পুর্ণ মিথ্যা...সে ভদ্রলোক আমার এখানেও আজ সকালে এসেছিল···এসে···

মুকুল বাধা দিল, বলিল—আমার কথা শেষ করতে দিন দয়া করে'···

—বলুন আপনি...

মুকুল বলিল—তারপর চিন্তাহরণ বাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর এ সম্বন্ধে অনেক কথা হয় রাত্রে...চিন্তাহরণ বাবুর স্ত্রী বলেন, এর মোকাবেলা করতে আপনার সঙ্গে...আজ তারি জন্য তিনি বলেন জাহ্নবীকে আসতে আপনার কাছে···আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে।

আদিত্য বলিল—বেশ, আমি এখনি যেতে রাজী আছি!

মুকুল চাহিল জাহ্নবীর দিকে...জাহ্নবী মুকুলের দিকে চাহিয়াই মৃদু কণ্ঠে বলিল—তার আর দরকার নেই মুকুল বাবু···এ-সম্বন্ধে মিথ্যে

একটা গোলমাল করে লাভ কি? বাড়ীতে চাকর-বাকর আছে... তারাই বা কি ভাববে?

আদিত্য বলিল—কিন্তু...

জাহ্নবী বলিল—চলুন মুকুল বাবু...বাড়ী যাই।

এ-কথা বলিয়া জাহ্নবী গমনের উদ্যোগ করিল...মুকুল বলিল—আচ্ছা, নমস্কার!

আদিত্যর বুকখানা যেন দু' পা দিয়া মাড়াইয়া দু'জনে চলিয়া যাইতে চায়!

আদিত্য বলিল—আমার কোনো কথা তাহলে আপনারা শুনবেন না? এখানে যাদের দেখছেন, বা যে-সব কথা শুনেছেন, সে-সব সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার থাকতে পারে তো!! কৈফিয়ৎ?

জাহ্নবী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল—তার দরকার নেই।

আদিত্য বলিল—একজন যদি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে যায়, সেইটেই বড় হয়ে থাকবে? সত্য হয়ে থাকবে?

মুকুলের দিকে চাহিয়া জাহ্নবী বলিল—নিজের চোখে যা দেখছি··· তাও অবিশ্বাস করবো?···কথার শেষে জাহ্নবীর অধরে মলিন হাসির রেখা ফুটিল।

কথা শুনিয়া আদিত্য স্তম্ভিত···

জাহ্নবী আর দাঁড়াইল না···চলিতে সুরু করিল। তার পিছনে মুকুল ··· ষ্টীমারের পিছনে বাঁধা লঞ্চ যেমন ষ্টীমারের সঙ্গে চলে, তেমনি ভাবে।

আদিত্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল···ক্ষোভে অভিমানে তার মন যেন পাথর···সেই সঙ্গে সমস্ত দেহখানাও!

ভবিষ্যৎ

আদিত্য হোটেলে ফিরিয়া আসিল···সমস্ত পাহাড়খানা যেন তার বুকের উপরে চাপিয়া বসিয়াছে···বুকে সেই পাহাড়ের ভার বহিয়া।

আসিয়া দেখে, মেয়েটি মেঝেয় পড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে···ছেলেটি টেবলের ড্রয়ার খুলিয়া একরাশ কাগজ বাহির করিয়া দু'হাতে টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িতেছে।

সর্ব্বনাশ!···তারি লেখা উপন্যাসের কাপি!

তাড়াতাড়ি কাগজগুলা কাড়িয়া লইয়া ড্রয়ারে পুরিয়া ড্রয়ারটা ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া আদিত্য বসিল একখানা বেতের চেয়ারে। মেয়েটা কাঁদিয়া ককাইতেছে...সেদিকে চাহিয়াও দেখিল না। মনের মধ্যে রাশীকৃত অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে!

জাহ্নবী অভিমান করিয়াছে...রাগ করিয়াছে! আদিত্য রাগে জ্বলিয়া উঠিল···মনে মনে বলিল, তার ও-রাগে আদিত্যর আসিয়া যায় না! বিবাহ করিবে না? না করুক! সে-ও চায় না জাহ্নবীকে! এমন দুর্ব্বল জাহ্নবীর মন! কে একটা কথা বলিয়াছে···সে-কথা সত্য কি মিথ্যা যাচাই করিবে না?···এমন মনের মেয়েকে বিবাহ করিলে সারা-জীবন জ্বলিতে হইবে! সংসার করিতে বসিলে মানুষের জীবনে কত ঘটনা ঘটে...অকল্পিত...অবাস্তব ঘটনাও...আর তেমন-কিছু ঘটিলে তার জন্য দরদ নাই, মমতা নাই...সব-কিছু না জানিয়া, না শুনিয়া এমনিভাবে সরিয়া যাওয়া...এমন অধৈর্য্য লইয়া ঘর করা চলে না! ..

তারি একটা গল্পে...এই ও-মাসের কাগজে ছাপা গল্প...সে গল্পে আদিত্য একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছে...জীবনে চাই কতখানি সহিষ্ণুতা...কতখানি ধৈর্য্য...একটু ইঙ্গিতে ক্ষেপিয়া

ধৈর্য্য হারাইয়া গল্পের নায়ক বিনোদ কি সর্ব্বনাশ না করিয়াছিল! তারপর যেদিন নিজের মন লইয়া বিশ্লেষণ করিতে বসিল, সেদিন সব বুঝিয়া অনুশোচনার ভারে কতখানি দুর্ভোগ সহিতে হইল তাকে ...কিন্তু তখন সব সে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে! অনুশোচনায় আর যাই হোক, ভাঙ্গাকে আবার গড়িয়া তোলা যায় না!...

কিন্তু জাহ্নবী নয়...নিজেকে মুক্ত করা চাই...আগে। কোথা হইতে এ কি-জঞ্জাল আসিয়া তার ঘাড়ে চাপিয়াছে! এ জঞ্জাল বহিয়া বাঁচা চলে না! যেমন করিয়া হোক এ জঞ্জাল তাকে কাটিতেই হইবে!...

সে ডাকিল—বয়...

বয় আসিল।

আদিত্য তাকে বলিয়া দিল, যেখান হইতে পারে...একজন দাসী যেন আনিয়া দেয় ..এখনি! যদি সে দৈনিক বেতন চায়, তাই দিবে! ছেলে-মেয়ে দুটিকে দেখিবে শুনিবে বলিল, দাসী আনিয়া দিলে বয়কে আদিত্য খুশী করিবে...বখশিস্ দিয়া!

বয় বলিল—জী...

আদিত্য বলিল—যতক্ষণ পর্য্যন্ত দাসী না মেলে, এদের দেখা চাই।

বয় বলিল, তার এক আয়ি আছে...বহুৎ সাব-লোকের তাঁবে কাজ করিয়াছে...বাচ্ছা-লোককে বহুৎ পেয়ার করে...এ-কাজে বহুৎ পাকা...বহুৎ সাচ্চা...

আদিত্য বলিল—তাকে এখনি আনো।...তার হাতে এদের ভার দিয়ে আমি একবার বেরুবো।

বয় বলিল—জী...

বারো

আদিত্য এতটুকু বিলম্ব করিল না···আজকের মতো ছুটি! মনসা হালদারের সন্ধান লইতে হইবে।

এখানকার ভুটিয়া-পল্লীতে আবগারীর মনসা হালদার নামটি কারো প্রায় অবিদিত ছিল না। তাছাড়া ডিষ্টিলারিতে এখনো কাজ করে প্রভাতের সেই শীর্ণকায় অতিথি···মনসা হালদারের ভাইপো কালী হালদার।

একটা সম্ভাবনা তার অন্ধকার-মনের মধ্যে জোনাকির রশ্মির মতো জ্বলিয়া নিবিতেছিল...নিবিয়া জ্বলিতেছিল! যদি তাই হয়?

এত দুঃখেও তবু যেন তাহাতে একটু স্বস্তি!

কালী হালদারের আস্তানা মিলিল। বাজারের নীচে বস্তীর কোণে একটা উঁচু টীলার উপর কাঠের বাড়ী···মাথায় টিনের ছাদ···ছাদটি কবে সবুজ রঙ লাগানো হইয়াছিল, রৌদ্রে-জলে মাঝে মাঝে রঙ উঠিয়া ছাদটা দেখাইতেছে ঘেয়োর মতো।

ভবিষ্যৎ

বাড়ীর সামনে কতকগুলো পাহাড়ী ফুলের গাছ·· একদিকে খালি জায়গায় দেওয়ালের গা বহিয়া স্কোয়াশের লতানে গাছ...লাউয়ের পাতার মতো পাতার রাশি...মাঝে মাঝে স্কোয়াশ্ ঝুলিতেছে! সবুজ পাতার বুকে কপির ছোট ছোট ফুল দেখা দিয়াছে। কাঠের রেলিঙে ছু'তিনখানা শাড়ী শুকাইতেছে। বাড়ীর ছাদ ফুঁড়িয়া এক কোণ হইতে খানিকটা ধোঁয়া উঠিয়া আকাশে মিশিতেছে। মানুষ-জন কাহারো দেখা মিলিল না।

দ্বারের বাহিরে গড়ানে পথে দাঁড়াইয়া আদিত্য ডাকিল—মনসা বাবু···

জোরে স্বর বাহির হইল না। ক্ষোভে ছুঃখে অপমানে রাগে বুকের মধ্যে দারুণ বিপর্যয়···যেন কারা সব মারামারি-কাটাকাটি করিতেছে! সে-ভিড় ঠেলিয়া কথা বাহির হইবে কি···কারা যেন সবলে কথাকে চাপিয়া ধরিতে চায়!

কাশিয়া গলা সাফ করিয়া আবার ডাকিল—মনসা বাবু বাড়ী আছেন? মনসা বাবু?

ভিতর হইতে কোনো সাড়া মিলিল না।···

ছু' মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আদিত্য চাহিল বাড়ীর দিকে...জানলা...দরজা...কোনোখানে যদি মানুষের ছায়া দেখিতে পায়!

কোথাও এতটুকু ছায়া নাই!···

তখন পথে চারিদিকে চাহিল। লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে একজন মোটা বাঙালী-সাহেব পাশ দিয়া উঠিয়া গেলেন। মুখে মোটা চুরুট···

ঠোঁটের উপর গোঁফের বোঝা। সাহেবের সঙ্গে একটা কুকুর···কুকুরটা ভিখারীর মতো পথের দু'দিকে লোলুপ নাসা গুঁজিয়া ঘ্রাণ লইতেছে··· পথে যদি কিছু দাঁও লাগিয়া যায়!...

বাঙালী-সাহেব চলিয়া গেলে···ওদিক হইতে এক হাস্যময়ী ইংরেজ ললনা রুজে-ব্লুমে গালে গোলাপী আভা...মুখে হাসি···হাস্যময়ীর সঙ্গে এক তরুণ যুবা···দু'জনে গায়ে-গায়ে মিশিয়া হাসি-গল্পে যেন ফুল ছড়াইয়া পথ চলিয়াছে!

দেখিয়া বুকের কোণে কোথায় যেন কাঁটা বিঁধিল! মনে পড়িল জাহ্নবীর কথা। দার্জ্জিলিঙে আসিয়া ইহাদের মতো একদিন এমনি হাসি-গল্পের ফুল ছড়াইয়া সারা পাহাড় পরিভ্রমণ করিবে, ভাবিয়াছিল! সে-আশা জন্মের মতো দুরাশার তিমিরে মিলাইয়া অদৃশ্য হইল!···

একটা মস্ত নিশ্বাস! মিথ্যা এ সব চিন্তা! ভুল বুঝিয়া জাহ্নবী যদি তার উপর অপ্রত্যয় পোষণ করে,···তার জন্য এ-হা-হুতাশে কি লাভ! মন বলিল, মনের খেয়ালে সে তোমাকে প্রশ্রয় দিয়াছিল···এখন সে-খেয়াল ভাঙিয়াছে! চিঠিতেই তো লিখিয়াছিল ঐ মুকুল ব্যারিষ্টারের কথা! মুকুল দু'দিন কাছে ছিল না···তাই ক্ষণেকের খেয়ালে হয়তো মনে জাগিয়াছিল অভিমান·· তাই তাকে চিঠি লিখিয়া আসিতে বলিয়াছিল। তারপর মুকুল ফিরিয়া আসিবামাত্র আবার সেই মুকুলকে লইয়া যত কিছু আনন্দ···পা মচ্‌কাইয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছে··· নিত্য আসিয়াছে···আদিত্যর সঙ্গে ক'টা কথা কহিয়াছে? ঐ মুকুল··· তার সঙ্গে খেলা···তারি সঙ্গে হাসি-গল্প···

মনকে চাবুক মারিয়া বলিল, বামন হইয়া যেমন···চাঁদের লোভ করিয়াছিলি।

আর একটি নিশ্বাস···! নিশ্বাস ফেলিয়া আদিত্য ফটক ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল। ডাকিল,—হালদার মশাই বাড়ী আছেন?

এবার সাড়া মিলিল। ভিতর হইতে কে বলিল—কে?

পুরুষের কণ্ঠ।

আদিত্য কি ভাবিল...তারপর বুদ্ধি করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি বিদেশী লোক···নাম বললে চিনতে পারবেন না।

—আচ্ছা, দাঁড়ান···যাচ্ছি।

আদিত্য নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল···অন্দরের দিকে দুই কাণ উন্মুখ··· উদগ্র রাখিয়া!

তারপর বাহির হইয়া আসিল পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়সের এক যুবক।

যুবা বলিল—কাকে চান্?

আদিত্য বলিল—মনসা বাবু আছেন?

যুবা বলিল আজ্ঞে না, তিনি আজ একমাস এখানে নেই।

—এখানে নেই!

যুবা বলিল—না। তিনি গেছেন তিন দিন ধরিয়া তাঁর জামাই সেখানে রেলে কাজ করেন সেই জামাইয়ের বাড়ী।

—ও...তা, কালী বাবু আছেন?

যুবা বলিল—না,···তিনি আপিস গেছেন।

আদিত্য কি ভাবিল, তারপর বলিল—আপনি মনসা বাবুর কে হন?

—ছেলে।

—ও···আচ্ছা···তাহলে আপনার সঙ্গেও সে-কথা হতে পারে··· যে-কথা আমি বলতে এসেছি।

—বলুন···

যুবা তারপর চাহিল অন্দরের দিকে...ডাকিল—কাঞ্চি...দোঠো কুর্শী লাও ..

এক পাহাড়ী দাসী দড়ির দু'খানা মোড়া লইয়া আসিল।

দাসীর মোড়া দেওয়া দেখিয়া আদিত্য চিনিল...এ সেই দাই... সকালে তার ঘরে ছেলে-মেয়ে দুটোকে ফেলিয়া আসিয়াছে।

মোড়া দু'খানা রৌদ্রে অঙ্গনে পাতিয়া যুবা বলিল—বসুন...

আদিত্য মোড়ায় বসিল...যুবাও বসিল আর-একটায়।

আদিত্য বলিল—শিলিগুড়ির দুর্গাচরণ চৌধুরীর ছেলেকে আপনি চেনেন ?

দু'চোখে বঁড়শী গাঁথিয়া যুবা চাহিল আদিত্যর পানে . বঁড়শী দিয়া যেন আদিত্যর মনের গহন-তল হইতে সুগভীর রহস্য তুলিবে।...

যুবা বলিল—দুর্গাচরণ চৌধুরী...মানে, যাঁর কাঠের কারবার ছিল শিলিগুড়িতে ?

—হ্যাঁ···হ্যাঁ।

—ছেলেবেলা থেকেই তাঁর নাম শুনেছি তাঁর বড় ছেলে আদিত্য বাবু...সেই আদিত্য বাবু আমার ভগ্নীপতি। মানে, আমার পিসতুতো বোনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

আদিত্যর বুকের উপর যেন প্রকাণ্ড গোলা আসিয়া পড়িল! সে গোলায় বুকখানা ভাঙ্গিয়া যেন চুর! ·

কোনোমতে নিজেকে সম্বৃত করিল। ভাবিল, বেশ মজার উপন্যাস তো! বাঃ! মনে অজস্র কৌতুক ফুটিল। সে ভাব গোপন করিয়া বলিল—আদিত্য বাবুকে তাহলে আপনি জানেন?

—জানি বৈ কি! আমার ভগ্নীপতি হন্।

—এখানে চায়ের যে-দোকান ছিল...সে-দোকান করেছিল আপনার ঐ ভগ্নীপতি আদিত্যবাবু?

—হ্যাঁ।

—বটে!...আচ্ছা, সেই আদিত্য বাবু এখানে আছেন?

যুবকের চোখের দৃষ্টি হইল গম্ভীর কঠিন। যুবক বলিল—না, তিনি আজ দু'বছর নিরুদ্দেশ।

—নিরুদ্দেশ!

—হ্যাঁ। তাঁর স্ত্রী...ছেলে-মেয়ে···মানে, আমাদের রাতুদি···এরাসব আমাদের এখানেই পড়ে আছে সেই অবধি!

আদিত্যর মনে যেন ঝড়ের দোলা। আদিত্য বলিল—আদিত্য বাবুর ছেলে-মেয়ে এখানে আছে?

যুবা বলিল—আদিত্য বাবুকে হঠাৎ এখানে পাওয়া গেছে···দু' বছর পরে। লুকিয়ে একটা হোটেলে এসে উঠেছেন। তা আমার কালীদা...খুড়তুতো ভাই...কালীদা তাঁর কাছে সেই হোটেলে ছেলে-মেয়ে দুটিকে দিয়ে এসেছে ..

আদিত্যর মনে যেন জোয়ারের জল উপছিয়া উঠিল! মনের দুই কূল ছাপাইয়া এখনি বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবে...

কোনোমতে ধৈর্য্য রাখিয়া আদিত্য বলিল—আপনি তাহলে আদিত্য বাবুকে চেনেন ?

যুবা বিরক্ত হইল। ভ্রূকুটি সহকারে আদিত্যর পানে চাহিল। বলিল—এই কথা বলতে এসেছেন আপনি ?

—শুধু এইটুকুই নয়! আদিত্য বলিল—আমি বলতে এসেছি, আপনি আদিত্য বাবুকে চেনেন না...আপনার কালীদা...কিম্বা বাবা মনসা হালদারও আদিত্য বাবুকে চেনেন না!

—কি রকম ?...যুবার স্বরে একরাশ বিস্ময়!

আদিত্য বলিল—মানে, আপনাদের ঘাড়ে-পড়া ছেলে-মেয়ে দুটির বোঝা এক নিরীহ ভদ্রলোকের ঘাড়ে ফেলে আপনারা নিজেরা চান আরাম! কিন্তু এভাবে আরাম পাওয়া যায় না! যাকে আপনাদের বাড়ীর ভাগ্নী-জামাই আদিত্য বাবু বলে আপনারা জুলুম-জবরদস্তি করছেন, অপমান করছেন, তিনি আপনাদের জামাই নন্। আপনাদের এ জুলুম তিনি বরদাস্ত করতে নারাজ। এ জুলুমের জন্য তিনি আপনাদের নামে শুধু পুলিশ-কেস্ করবেন না...ড্যামেজের নালিশ করবেন। আমি এখানে আপনাদের সেই কথা বলতে এসেছি!

বাড়ী বহিয়া গায়ে পড়িয়া কোনো ভদ্রলোক এমন সব কথা বলিতে আসে না···আসিতে পারে না···এ জ্ঞান মনসা হালদারের যুবক পুত্রের বিলক্ষণ আছে···অথচ!

সে তাই শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!

আদিত্য বলিল—আর একটু স্পষ্ট করে বলতে হবে? বেশ,

তবে শুনুন···আপনাদের বাড়ী থেকে কে না কি···বোধ হয়, আপনার ঐ কালীদা···এখানে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে নানা কথা বলে এসেছেন···এক নিরীহ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে যা-তা অপমানের কথা। তাতেও খুশী না হয়ে আজ সকালে তুটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে গিয়ে এক নিরীহ ভদ্রলোকের ঘাড়ে চাপিয়ে এসেছেন···তাঁর হোটেলে!

যুবা বাধা দিল, বলিল—কিন্তু আপনি ভুল করছেন। হোটেলে যাঁর কাছে ছেলে-মেয়ে দিয়ে এসেছেন, তিনিই আদিত্য বাবু।

আদিত্য রাগিয়া উঠিল···বলিল—তিনি আদিত্য বাবু হতে পারেন কিন্তু আপনাদের আদিত্য বাবু···আপনাদের নিরুদ্দেশ-জামাই আদিত্য বাবু তিনি নন্!

যুবা বলিল—কি বলেন আপনি!

সকৌতুক কণ্ঠে আদিত্য বলিল—আপনি তো আপনাদের জামাই আদিত্য বাবুকে চেনেন, বললেন।

—চিনি বৈ কি···খুব চিনি। এক-বাড়ীতে এত-কাল একসঙ্গে বাস করেছি···

—হুঁ···তাহলে ভুল হবার কথা নয়!

—না···

—বেশ···দেখুন তো মশাই আমার দিকে চেয়ে···আমি যদি বলি আমার নাম আদিত্য বাবু···আমিই আজ কিছু দিন হিল-ভিউয়ে বাস করছি আর আমার ঘাড়ে আপনার কালীদা গিয়ে আপনার ঐ রাঙ্গাদির দুই ছেলে-মেয়ে চাপিয়ে এসেছেন, তাহলে আপনি তার জবাবে কি বলবেন?

দুম্ করিয়া যেন বোমা ফাটিল। মনসা হালদারের যুবক পুত্র একেবারে স্তম্ভিত!

আদিত্য বলিল—আপনি বলতে চান…আমি আপনাদের জামাই আদিত্য বাবু? আমার সঙ্গে আপনার রাঙ্গুদির বিয়ে হয়েছিল? আমি এখানে চায়ের দোকান খুলেছিলুম? তারপর স্ত্রী-পুত্রাদি ফেলে চায়ের দোকান তুলে দিয়ে আজ দু' বছর আমি নিরুদ্দেশ?

যুবার মুখ শুকাইয়া গেল…ঢোক গিলিয়া যুবা বলিল…কিন্তু কালীদা ফটো নিয়ে এসেছে…সে ফটো দেখে আমরা সকলে…আমার রাঙ্গুদি পর্য্যন্ত…

আদিত্য বুঝিল সেই ফটো…"সৎ-নাম" পত্রিকাদের তোলা তার ফটোগ্রাফ…হোটেলের ঘর হইতে হঠাৎ যে চুরি গিয়াছিল…

বলিল—আনতে পারেন সে ফটো?

—নিশ্চয়। এখনি আমি আনছি।

বলিয়া যুবা উঠিয়া গেল এবং পরক্ষণেই ফটো আনিয়া আদিত্যর হাতে দিল।

ফটো দেখিয়া আদিত্য হাসিল, হাসিয়া বলিল—আমার ফটোগ্রাফ… আমার সঙ্গে চেহারায় মিল আছে…দেখছেন?

—দেখছি।

—আমার এ ফটো চুরি গিয়েছিল। কিন্তু ফটো নিয়ে কথা নয়… আসল আদিত্যকে সামনে দেখছেন…আর আমাকে আপনাদের জামাই আদিত্য বলে যখন স্বীকার করবেন না…তখন বলতে পারেন আপনার কালীদার কি এক্তিয়ার আছে যে আমাকে ধমক দিয়ে কটুকাটব্য করে

আপনার ভগ্নীর ছেলে-মেয়েদের আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হন?

কথা শুনিয়া যুবা স্তম্ভিত!...তার মাথায় যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়াছে!

আদিত্য বলিল—যদি ভালো চান, এখনি সে ছেলে-মেয়ে দুটিকে ফিরিয়ে আনবেন, চলুন...আর যাঁর কাছে আপনার কালীদা গিয়ে যা-নয়-তাই মন্দ কথা বলে এসেছেন, তাঁর কাছে গিয়ে এখনি এ ভুলের জন্য মাপ চেয়ে আসা চাই। তা যদি না করেন, তাহলে আপনার কালীদার নামে আমি কোর্টে নালিশ করবো। দেওয়ানী-ফৌজদারী দুই কোর্টেই দু নম্বর মামলা রুজু করে দেবো।

যুবার মন হায়-হায় করিয়া উঠিল! সকালে মনে আশার ঢেউ উঠিয়াছিল। পোষ্য রাজুদি...নিরাশ্রয়...পরের দ্বারে দুঃখিনীর মতো ছেলে-মেয়ে লইয়া পড়িয়া আছে তার দুর্দ্দশা ঘুচিয়াছে ভাবিয়া...এখন সে-আরামের পরিবর্ত্তে দু' নম্বর মকর্দ্দমা!

আদিত্য বলিল—চুপ করে কি ভাবছেন?

যুবা বলিল—ভাবছি...আপনি আর একটু বসুন...আমার ভগ্নীপতি অর্থাৎ রাজুদির স্বামীর একখানা ফটো আছে...সেই ফটো এনে আপনাকে দেখাচ্ছি। সে ফটো দেখে আপনি...

আদিত্য বলিল—বেশ...আসুন আপনার ভগ্নীপতির ফটো...আমি বসছি।

যুবা গিয়া ফটো আনিল...ভগ্নীপতির ফটো।

আদিত্য দেখিল। দেখিবামাত্র মাথার মধ্যে রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল!...

তারপর যুবার দিকে চাহিয়া শান্ত স্বরে বলিল—এই ফটো আমার বলে মনে হয়? দেখুন দিকিনি বেশ করে মিলিয়ে...

এ কথা বলিয়া যুবার হাতে ফটো দিল...তারপর কৌতুহলী-নেত্রে যুবার পানে চাহিয়া আবার বলিল—দেখুন...ভালো করে' দেখুন।

যুবা এ কথা শুনিল একান্ত মনোযোগে,...তারপর ফটোর সঙ্গে আদিত্যর মুখ বেশ খানিকক্ষণ ধরিয়া মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিল... দেখিয়া বলিল—ও-ফটোখানাও দিন...

তার ফটোখানাও আদিত্য দিল।

দু'খানি ফটো পাশাপাশি ধরিয়া মিলাইয়া দেখিয়া যুবা বলিল—কিছু মিল আছে...এ ফটোখানা বহু দিন আগেকার তোলা কি-না...

শ্লেষ-জড়িত হাস্যে আদিত্য বলিল—তাহলেও আমাকে তো সামনে দেখছেন মশাই, আমাকে দেখে মনে হচ্ছে...আমি আপনার ভগ্নীপতি? ...বলুন!

যুবা থ' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল...ভাবিল, তবে কি কালীদা ভুল করিয়া বসিয়াছে! ভুল বলিয়া এমন মারাত্মক ভুল!...সে বিহ্বলের মতো নির্ব্বাক...মুখে কথা ফুটিল না।

আদিত্য বলিল—আপনাদের সে ছেলে-মেয়ে দু'টিকে গিয়ে নিয়ে আসবেন? না, তাদের অনাথ আশ্রমে জমা করে দেবো?

যুবার বুকের মধ্যে যেন ষ্টীম-রোলার চলিতে লাগিল। সে কি বলিবে? কালীদা বাড়ীর কর্ত্তা...বাবা মনসা হালদার এখানে বড় থাকে না...রিটায়ার করিয়া তিনধরিয়ায় দিদির ওখানেই আস্তানা একরকম কায়েমি করিয়াছে!

আদিত্য বলিল—বলুন…

যুবা বলিল—আজ্ঞে, কালীদা যা করেছে…সে সম্বন্ধে আমি কি করতে পারি বলুন ? তিনি আমার গার্জেন…

আদিত্য ফুঁশিয়া উঠিল,—গার্জেন তো কি ? মাথা কিনেছেন যেন। আপনি নাবালক শিশু নন্…বলতে চান, কখন আপনার কালীদার দয়া হবে, তিনি ছেলে-মেয়ে নিয়ে আসবেন, আমি সেই আশায় পরের বোঝা বইবো ! কেন, বলুন তো মশাই ?

যুবা বলিল—আমি এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে পারি না মশায়। আপনি কালীদার সঙ্গে দেখা করে এর বোঝাপড়া করবেন।

—কোথায় আপনার কালীদা ?

—অফিসে কাজ আছে, তাই গেছেন।

—কখন বাড়ী ফিরবেন ?

যুবা বলিল—বেলা এগারোটা নাগাদ ফিরবেন বোধ হয় ! খাওয়া-দাওয়া করে' বেরোননি তো !

—বেশ…আমি একটু পরে এখনি আবার আসছি। তাঁকে বলবেন, ডিষ্টিলারীতে কাজ করেন…মস্ত লোক…এমনি নানা কথা লাগিয়ে এসেছেন ! তাঁকে আমি সহজে ছাড়বো না। আইন আছে…আদালত আছে…এ কথা তিনি যেন খেয়াল করেন !

এ কথা বলিয়া আদিত্য নিরুপায় আক্রোশে বাহির হইয়া আসিল।

যুবা চুপ করিয়া যেমন ছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল…কে যেন স্ক্রুপ দিয়া তাকে সেখানে আঁটিয়া দিয়াছে !

তেরো

হালদার-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আদিত্য ভাবিল, একবার চিন্তাহরণ বাবুর গৃহে যাইবে। তিনি যে কোথাকার এক অজানা লোকের কথা শুনিয়া তাকে অমন শেয়াল-কুকুরের মতো তাড়াইয়া দিলেন···

কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিবেন···বিবাহ এখনো দেন নাই···তা'ও এ-বিবাহ! আদিত্যের তাগিদে নয়···তাঁর মেয়ে, তাঁর স্ত্রী···তাঁরাই এ বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন!···আদিত্য জানে, তার পয়সা নাই বলিয়া এ বিবাহে চিন্তাহরণের আপত্তি ছিল। নেহাৎ স্ত্রী ও কন্যাকে মানিয়া চলেন বলিয়াই···

জাহ্নবীকে পাইবার জন্য আদিত্য যতই অধীর হোক,···তার একটা মর্য্যাদা আছে তো! চিন্তাহরণ বাবুর না হয় পয়সাই আছে···আদিত্যর পয়সা নাই···কিন্তু খ্যাতি? তার নাম বলিলে বাঙলা দেশের শিক্ষিত সমাজে কে না চিনিবে?···পয়সা? আজ নাই···কিন্তু কোনো দিন হইবে

না...কে বলিতে পারে! মানুষের ভবিষ্যৎ...বর্ত্তমানকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সে-ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের মতো গড়িয়া ওঠা অসম্ভব নয়! ..

চিন্তাহরণ বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া শুধু একটা প্রশ্ন করিবে। বলিবে, আপনি যে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিলেন...কেন? আদিত্যর অসাক্ষাতে সে-লোক যে-কথা বলিয়া গিয়াছে, সে-কথা যাচাই করিয়া লওয়া উচিত ছিল না কি?...জাহ্নবীর সঙ্গে বিবাহ দিন, না দিন... আসিয়া যায় না! কিন্তু এ-কথা বলিয়া চিন্তাহরণ বাবুকে একটু শ্লেষ...

এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। মাথায় ঝাঁজ ফুটিতে লাগিল ...সে-ঝাঁজে তাতানো অনেক কথা ফেনার মতো ভাসিয়া উঠিতেছিল ...সে-ফেনার নীচে জাহ্নবীর কথা কোথায় চাপা পড়িয়া গেল!...

ঐ চিন্তাহরণ বাবুর বাঙলো! দূর হইতে আদিত্য দেখিল, সামনের বারান্দায় চাকররা মোট-ঘাট বাঁধিতেছে।

ব্যাপার কি?

আদিত্য আসিল ফটকের সামনে...নাগিনা চাকরকে দেখিল। বাহির হইতে ডাকিল—নাগিনা...

সে-ডাকে নাগিনা কাছে আসিল।

আদিত্য বলিল—বাবু আছেন?

নাগিনা বলিল—না।

—মা?

নাগিনা বলিল, না, বাড়ীতে কেহ নাই! নিমন্ত্রণ গিয়াছেন...ঐ মুকুল সাহেবের কোঠী। তারপর আজই সব কলিকাতায় চলিয়াছেন। সেই জন্য মোট-ঘাট বাঁধা হইতেছে।

আদিত্য চমকিয়া উঠিল, কহিল—আজ কলকাতায় যাচ্ছেন...কেন? হঠাৎ এমন?

নাগিনা বলিল, কি নাকি জরুরি তার আসিয়াছে...সেখানে না গেলে নয়।

বটে!

এখন তাহা হইলে সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই!

ষ্টেশনে গিয়া দেখা করিবে?...কিন্তু সেখানে এত কথা হইবে না তো!...আদিত্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল...নাগিনা বলিল, আর কোনো প্রশ্ন আছে কি না? তার কাজ আছে।

তাও বটে! আদিত্য বলিল—না...আর কোনো কথা নয়। ফিরলে মাকে শুধু বোলো, আমি এসেছিলুম।

নাগিনা জানাইল, এ কথা সে বলিবে।

তারপর আদিত্য ফিরিল...

ফিরিল হিল-ভিউয়ে...নিজের ঘরে।...

বয় তার আয়িকে আনিয়াছে...ছেলে-মেয়েদের লইয়া আয়ি খেলা করিতেছে।

আদিত্য মনে মনে হাসিল। ষ্টেজের উপরে যেন প্রহসনের অভিনয় চলিয়াছে!...এমন প্রহসনের কল্পনাও তার মনে কখনো উদয় হইবে, ভাবে নাই! মনে হইল, সেই যে কথা আছে truth is stranger than fiction...সে-কথা এতখানি খাঁটী হইতে পারে...আশ্চর্য্য! এ ব্যাপার লইয়া সে যদি গল্প লিখিত...লোকে তাচ্ছল্য-ভরে সে-লেখা ফেলিয়া দিত...বলিত, আজগুবি!

আয়িকে সে কোনো কথা বলিল না…ছেলে-মেয়েদেরও ডাকিল না। …ঘড়ির দিকে চাহিল…বেলা দশটা বাজিয়াছে। ভাবিল, চট্ করিয়া স্নানাহার সারিয়া লই। তারপর এগারোটা নাগাদ কালী হালদারের বাড়ী…তারপর সেখান হইতে একবার ষ্টেশন।…ওঁরা চলিয়া যাইবার আগেই একবার গিয়া·· কথা না হয় না হইবে…অন্ততঃ বীরের মতো একবার সামনে গিয়া দাঁড়াইবে!…

তেল মাখিয়া বাথ-রুমে ঢুকিল। স্নান করিতে করিতে আদিত্যর চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল মুকুলের ছবি! ব্যারিষ্টার মুকুল! লোকটা রন্ধ্র খুঁজিতেছিল…শ্রীবৎস রাজার দেহে প্রবেশ করিবার জন্য শনি-গ্রহ যেমন একদিন রন্ধ্র খুঁজিয়াছিল…তেমনি!

জাহ্নবীকে ঠিক ও বিবাহ করিবে। ব্যারিষ্টার তো নামে…কোর্ট কামাই করিয়া যে ব্যারিষ্টার দার্জ্জিলিংয়ের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় রূপসী কিশোরীর পিছনে ল্যাংবোটের মতো…তার পশার যা হইবে, ভগবান জানেন! আদিত্য ব্যারিষ্টার নয়…বাপের পয়সায় ভর করিয়া দিন কাটায় না…নিজের রোজগারের টাকা খরচ করে! নিজের রোজগারের টাকায় সে দার্জ্জিলিংয়ে আসিয়াছে…পরের পয়সা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে আসে নাই!

একটার পর আর একটা…এমনি নানা চিন্তায় মুকুলের পাশে নিজেকে ঠেলিয়া দাঁড় করাইয়া বিচার করিল। বিচারে তারি হইল জয়! ব্যারিষ্টার হইলেও মুকুল তার অনেক নীচে! কিসের জন্য মুকুলকে সে সমীহ করিয়া চলিবে? কেন মুকুলকে এত দিন পেট্রনাইজ করে নাই ভাবিয়া গ্লানির ভারে মন ভারী হইয়া উঠিল।

স্নান সারিয়া আহারে বসিয়াছে…বয় আসিয়া একখানা চিঠি দিল। খামে-ভরা চিঠি।

তখনি খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া আদিত্য পড়িল।

মেয়ে-হাতের লেখা চিঠি…মাথায় কোনো সম্বোধন নাই। চিঠিতে শুধু লেখা আছে :

আপনি আসিয়া আমার ভাই স্থরথের সঙ্গে যখন কথা কহিতেছিলেন, আড়ালে থাকিয়া আমি সে সব কথা শুনিয়াছি। ইঁহারা বোধ হয় মস্ত একটা ভুল করিয়াছেন।

আমার স্বামী পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁর নাম আদিত্য চৌধুরী। শ্বশুরের নাম বলিয়াছিলেন ৺দুর্গাচরণ চৌধুরী…বাড়ী শিলিগুড়ি! এখানে ঐ নামেই তিনি চায়ের দোকান খোলেন। দোকান মন্দ চলে নাই; কিন্তু তাঁর নানা দোষ ছিল। একদিন শেষে দেনার দায়ে নিরুদ্দেশ হইয়া গেছেন! আজ পর্য্যন্ত দেখা নাই।

তাঁর ছেলে-মেয়ে লইয়া এ বাড়ীতে আমি যে কষ্টে বাস করিতেছি …দেখিলে শেয়াল-কুকুরের চোখেও বোধ হয় জল আসিবে! আমার কোনো কুলে কেহ নাই।!

স্বামীর মুখে শুনিয়াছিলাম, তাঁর ছোট ভাই আছেন। কলিকাতায় থাকেন…ছোট ভাইয়ের নাম শ্রীযুক্ত মাণিক্যচন্দ্র চৌধুরী।

ঘাড় হইতে আমাদের নামাইবার জন্ম কালীদা আকুল। আমার মামা (মনসা বাবু) আশ্রয় দিতে অরাজী নন্…কিন্তু কালীদা এখন

বাড়ীর কর্ত্তা। মামা এখানে থাকেন না। মামীমার মৃত্যুর পর তাঁর বাত হয়। বাতে কে সেবা করে, তাই তিনি তাঁর মেয়ের কাছে আছেন তিনধরিয়ায়। তাঁর মেয়ে···আমার বড়দি···মামাকে খুব যত্ন করেন। মামার একটি ছেলে ..সুরথ। সে ডিষ্টিলারীতে চাকরি করিতেছে। এ-বাড়ীতে তার অংশ আছে...কাজেই কালীদা তাকে ঠেলিতে পারে না।

এখানে প্রায় প্রতি ট্রেণে কালীদা নজর রাখে। বলে, যদি কোনো দিন আমার স্বামী ফিরিয়া আসেন, তাঁকে ধরিয়া আনিবে। আপনাকে দেখিয়া অবধি কালীদার মনে সন্দেহ! বলে, চেহারা সামান্ত বদলাইয়াছে···তবু চিনিতে কষ্ট হয় না। আপনার ফটোগ্রাফ আনিয়া আমার স্বামীর পুরানো ফটোর সঙ্গে মিলাইয়া কালীদা বলে,···কিছু কিছু মিল আছে...নিশ্চয় সে-ই। তারপর যাহা ঘটিয়াছে, আপনি জানেন।

আমাকেও কালীদা এ-বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে। বলিয়াছে, যার দায়, তার কাঁধে গিয়া ভর করো।

আমার মনে কিন্তু সন্দেহ আছে···তাই ছেলেমেয়ের সঙ্গে যাই নাই। শত লাঞ্ছনা সহিয়াও এখানে পড়িয়া আছি।

আপনার কথা আজ আমি শুনিয়াছি...আড়াল হইতে আপনাকে দেখিয়াছি। আমার মন বলিতেছে, আপনি যেন তাঁর সেই ছোট ভাই! যদি তাই হয়···দয়া করিয়া আমার উপায়ও যদি না করেন, ছেলেমেয়ে দুটোর উপায় করিয়া দিবেন। তারা যদি সত্যই আপনার ভাইয়ের ছেলেমেয়ে হয়, কেন এখানে পড়িয়া আমার সঙ্গে তারা লাথি-ঝাঁটা

খাইবে ? আমি মেয়ে-মানুষ···বাঙালীর ঘরের অসহায় মেয়ে-মানুষ··· লাথি খাইয়াও এ বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিব···এ বাড়ীর মাটী কামড়াইয়া থাকিব। কিন্তু নিরীহ দুটি ছেলেমেয়ে তারা কি দুঃখে লাথি খাইবে ! ওদের সঙ্গে আপনার যদি সম্পর্ক না থাকে, অনাথ-আশ্রমে দিবেন। আর যদি সত্যই ৺দুর্গাচরণ চৌধুরীর সঙ্গে আপনার কিছু সম্পর্ক থাকে; তাহা হইলে তাদের উপায় করিয়া দিবেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করিবেন। অনাথদের আপনিই ভরসা।

লুকাইয়া এ চিঠি পাঠাইলাম। আপনি নাকি বেলা এগারোটায় আসিয়া কালীদার সঙ্গে দেখা করিবেন, বলিয়া গিয়াছেন। তাই এ চিঠি পাঠাইলাম পাড়ার একটি ভদ্রলোকের হাতে। জবাব দিবার প্রয়োজন নাই। জবাব আমি চাহি না। ইতি

অভাগিনী রাজেশ্বরী

চিঠি পড়িয়া আদিত্যর মন মমতায় অভিভূত হইল। আহা, বেচারী !

মনের মধ্যে যে-সংশয় এতক্ষণ বিন্দুবাষ্পের মতো উদয় হইয়াছিল, চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সংশয়-বাষ্প মেঘের মতো প্রসার লাভ করিল।···

মাণিক্য-নামটাও গোপন নাই ! বুঝিল, এ কীর্ত্তি তার দাদার··· সহোদর বড় ভাইয়ের ! আদিত্য থাকিত কলিকাতায়···মাণিক্য বাপের কাছে শিলিগুড়িতে। পড়া ছাড়িয়া দিয়া বাপের সঙ্গে ব্যবসার কাজে যোগ দিয়াছিল। তারপর বাপের মৃত্যুর পর ছোট ভাই আদিত্যকে

ফাঁকি দিয়াছে। বলিয়াছিল, কারবারে ক'বছর দারুণ লোকসান যাইতেছিল···বহু টাকা দেনা···এবং সেই দেনার দায় মিটাইতে কারবারটিকে নাকি জলের দরে বিকাইয়া না দিলে নয়!

তারপর···এখানে আসিয়া এই কীর্ত্তি!···এখানে নিজের নাম সঠিক প্রকাশ করে নাই···'আদিত্য'-নাম বলিয়াছিলো। গোড়া হইতেই মনে নিশ্চয় দুরভিসন্ধি ছিল। দুরভিসন্ধি-বশে কাহাকেও ঠকাইয়া যদি টাকা লইত, কিম্বা ধনী-সমাজের কারো তহবিল ভাঙ্গিত···আদিত্যর মনে হইল, তাহা হইলেও অপরাধ বোধ হয় এত বেশী হইত না! এক অভাগিনীকে বিবাহ করিয়া তার সর্ব্বনাশ করিয়া এমনভাবে পলায়ন···তাও সে অভাগিনীর ঘাড়ে দু'-দুটো ছেলেমেয়ের ভার চাপাইয়া···হায়রে, এই লোক তার সহোদর বড় ভাই!

রাগে আদিত্যর কাণ-মাথা জ্বালা করিতে লাগিল।···

আহার সারিয়া সে ভাবিল, ওদিকে নিজের আরাম-বিলাসের সামগ্রী প্রেম...এদিকে এক অভাগিনীর সম্মান···

যে ছেলেমেয়ের উপর একটু আগে এতটুকু মমতা ছিল না···ঘাড় হইতে যাহাদের নামাইয়া দিবার জন্য আদিত্য অস্থির আকুল ছিল···এ-চিঠি পাওয়ার পর তাদের উপর মমতা জাগিল! একান্ত আপনার বলিয়া তাদের মনে হইল! সেই সঙ্গে মনে জাগিল···

বিজয়-লিপ্সা! যে-চিন্তাহরণ টাকা-পয়সা ছাড়া দুনিয়ায় কিছু জানে জানে না···মানুষ চেনে না...তাকে একবার দেখাইয়া দিবে···আদিত্য

মানুষ-হিসাবে তার চেয়ে কত বড়! মেয়ের সঙ্গে বিবাহ যদি হয়...
চিন্তাহরণ বুঝিবে,...কত-বড় মানুষকে জামাই করিয়া সে ধন্য হইয়াছে!

কিন্তু না, ও-চিন্তা এখন নয়। অভাগিনী রাজেশ্বরী...

আদিত্য চলিল কালী হালদারের গৃহের উদ্দেশে।

সেই গৃহ। যুবকের নাম সুরথ...রাজেশ্বরীর চিঠিতে জানিয়াছে।

আসিয়া ডাকিল—সুরথ বাবু আছেন?

প্রথম আহ্বানেই সাড়া মিলিল। ভিতর হইতে জবাব আসিল—কে?

অন্য গলা। বুঝিল, সুরথ নয়। হয়তো কালী হালদার!

আদিত্য বলিল—আমি এসেছি...আদিত্য চৌধুরী।

—ও...

একটু পরে কালী হালদার সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আদিত্য চিনিল...দী ভিলেন্!...বলিল—চিনতে পেরেছেন?

কালী বলিল—খুব চিনেছি। তারপর কি খবর?

আদিত্য বলিল—আমি এসেছি বলতে যে, ঐ দুটি ছেলেমেয়েকে যদি এখনি না নিয়ে আসেন, তাহলে আমি আদালতে নালিশ করবো। ...আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত...আমার ঘরে ঢুকে আমার অসাক্ষাতে আমার ফটোগ্রাফ নিয়ে এসেছেন...সে-কাজকে আইনের ভাষায় বলে—চুরি! তারপর চিন্তাহরণ বাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁর কাছে আমার নামে যে-সব কদর্য্য কথা বলে এসেছেন, তাতে হয় মানহানি করার অপরাধ। তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে আমার এ্যাবসেন্সে আমার ঘরে গিয়ে যে-সব কীর্ত্তি-কলাপ...আইনে তার নাম...ট্রেস্‌পাশ!...আপনি ডিষ্টিলারীতে কাজ করেন বলে অত আস্ফালন করে' এসেছেন...হয়তো

ডিষ্টিলারীতে থাকার দরুণ আপনার নেশার ঘোর একটু বেশী...কিন্তু আপনার ডিষ্টিলারীতে আর যাই তৈরী হোক, সেখানে আইন-কানুন তৈরীর ব্যবস্থা নেই...বুঝলেন! অতএব...

ঝোঁকের মাথায় ভদ্রলোককে যা-তা বলিয়া তার ঘরে ছেলেমেয়ে ফেলিয়া আসা ইস্তক কালী হালদারের মনে একটু যেন শান্তি মিলিয়াছিল! রাজেশ্বরীকেও ভদ্রলোকের বাড়ীতে চালান দিবার জন্য উন্মুখ ছিল...কিন্তু রাজেশ্বরী এখানকার মাটী এমন কামড়াইয়া বসিয়াছে! বলে,—সে ভদ্রলোক সত্যি তোমাদের জামাই কি না, ছাখো...না দেখে তার ওখানে কেউ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না...এতে আমাকে মেরেই ফ্যালো আর কেটেই ফ্যালো...আমি নড়বো না।

রাজেশ্বরীর এ-কথায় কালী হালদারের মনে সমস্যার মেঘোদয় হইয়াছিল। একটু সংশয়!...তারপর আজ অফিস হইতে ফিরিয়া সুরথের মুখে আদিত্যর যে-সব বৃত্তান্ত শুনিয়াছে...

শুনিয়া অবধি তার মনের মধ্যে সে সংশয় অনেকখানি ঘন হইয়া উঠিতেছিল। কালী হালদার ভাবিতেছিল, তাইতো ..রাজ্য জয় করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, এখন সে-রাজ্য চূর্ণ হইয়া যায়!

আদিত্যর কথায় কালী হালদারের মুখ বিবর্ণ হইল! মুখে যত আস্ফালনই করুক...জানে তো, অফিসের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে গিয়া আদিত্য যদি এ-সব কথা বলিয়া দেয়...

একেই অফিসে নানা ছুতা ধরিয়া সাহেব তাকে ধমক দেয়! সেদিন নেশার ঘোরে কামাই করিয়াছিল...বলিয়াছিল, বাড়ীতে অসুখ...তাই কামাই হইয়া গিয়াছে! সাহেব তাহাতে রাগিয়া ধমক দিয়া বলিয়া-

ছিল···বাড়ীতে অসুখ নয় হালদার···নিজের অসুখ! মদ খাইয়ে নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া ভুটিয়া-বস্তীতে পড়িয়াছিলে···

সাহেবের সে-কথায় কালী হালদারের মুখ যেন একেবারে মাটীর মধ্যে গুঁজিয়া গিয়াছিল! স্পাই আছে···নিশ্চয় স্পাই! নহিলে কোথায় ভুটিয়া-বস্তী···সাহেবের কাণে এ-কথা কি করিয়া গিয়া ঢোকে!

সাহেব ধমক দিয়া বলিয়াছে—সাবধান কালী হালদার···তোমার অনেক জুলুমের কথা, ধাপ্পাবাজির কথা আমার কাণে যায়···আমি গ্রাহ্য করি নাই···কিন্তু এবার কোনো কথা শুনিলে চাকরি-বরখাস্ত হইবে!···

নূতন সাহেব ভারী কড়া। ভালো ছিল ম্যাকফার্শন সাহেব.. যেন ব্যোম-ভোলানাথ! ভদ্র সাহেব! এ-সব দিকে দৃকপাত মাত্র ছিল না! এ সাহেবের মতো নজর তার এমন ছোট ছিল না!···দেখা হইলে একটু হাসিয়া সেলাম করিলেই ভোলানাথ-সাহেব খুশী থাকিত! আর এই সিম্পশন···বাপ, যেন দুর্ব্বাসা! শাপ দিয়া ভস্ম করিবে বলিয়া সর্ব্বক্ষণ শুধু খুঁৎ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে!

কালী হালদার জবাব না দিয়া আদিত্যর পানে চাহিল···অপরাধী হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া গেলে যে-দৃষ্টিতে তাকায়...তেমনি তার দৃষ্টি!

আদিত্য বলিল—বলুন, কি বলতে চান?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কালী হালদার বলিল—ছাপোষা মানুষ··· আপিসে মাইনে পাই তিরিশটি টাকা। বলুন তো মশাই, এ টাকায় পরের দায় কি করে সামলাই?

কালী হালদারের যে-কণ্ঠ বাজের মতো ভীম ভৈরব রবে ঘর্ঘরিত হইয়াছিল, সে-কণ্ঠ এখন মৃদু। তার উপর মুখে কি কাকুতির-ভাব···

দেখিয়া আদিত্যর হাসি পাইল। কিন্তু সে-হাসি চাপিয়া গম্ভীর কণ্ঠে আদিত্য বলিল—তা বলে যাকে পাবেন···নিরীহ ভদ্রলোক...তার মাথায় বোঝা চাপাবেন!

কালী হালদারের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। আমতা-আমতা করিয়া বলিল—কিন্তু পথে আপনাকে প্রথম যেদিন দেখি, দেখেই আমি চমকে উঠেছিলুম! তারপর আপনার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে কতদিন ভালো করে ঠাহর করেছি...বাড়ীতে আদিত্যর যে-ছবি আছে, সে-ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মনে-মনে বিচার করেছি। আমার বোনকে···মানে, রাজেশ্বরীকেও বলেছি এ-কথা। কতদিন তাকে বলেছি, আমার সঙ্গে তুই চ' রাজু···দেখলে তুই তাকে যেমন চট্ করে চিনতে পারবি, এমন আর কেউ পারবে না। আর পারতো চিনতে আমার কাকা···মনসা বাবু। তা তিনি তো এখানে থাকেন না!

আদিত্যর মনে একরাশ কৌতূহল·· আদিত্য বলিল—তাতে আপনার ভগ্নী কি বলেছিলেন?

কালী হালদার মনের আক্রোশ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বলিল—ও রাজী হলো না। বললে, পথে কার পিছনে আমি কুকুরের মতো ঘুরবো বলো তো কালীদা।···হুঁঃ···মেয়ে-মানুষের বুদ্ধি কিনা! আরে, তোর ভালোর জন্যই না আমার বলা···তা গ্রাহ্য হলো না আমার সে-কথা।

আদিত্য বলিল—তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। হাজার হোক, মেয়ে-মানুষ···তাঁর একটা ইজ্জৎ আছে তো!

কালী হালদার জ্বলিয়া উঠিল···ইজ্জৎ! এ ইজ্জতের মায়া না করিয়া

রাজেশ্বরী যদি তার কথামতো আগে গিয়া দেখিত, তাহা হইলে এমন দায় মাথায় থাকিলেও এ-ভদ্রলোক আজ বাড়ী বহিয়া আসিয়া এতখানি বজ্র-হুঙ্কার দিবার স্পর্দ্ধা পাইত কি?

কালী হালদার বলিল—তা নয়। মানে, ভাবলে, খাশা আছি···স্বামী কি চীজ্ জানে তো! তার পাশ কাটিয়ে এখানে এমন মজায় আছে...

কথা শেষ হইল না। আদিত্য দিল ধমক···ধমক দিয়া বলিল—থামুন। আপনি তাঁকে কি এমন রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছেন, শুনি ···যার জন্য তিনি···

কালী হালদারের মুখ পাংশু...বিবর্ণ।

আদিত্য তাহা লক্ষ্য করিল। লক্ষ্য করিয়া কথার স্রোত ফিরাইল; বলিল—যাক, আপনার ফ্যামিলি-ম্যাটার আপনি বুঝবেন···মোদ্দা আমি চাই, আপনি এখনি গিয়ে আপনার ভাগনে-ভাগনী দুটিকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করুন। নাহলে আমি এখান থেকে সোজা আপনার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছে যাবো। বাড়ীতে প্রতাপ দেখান বলে' সর্ব্বত্র দেখাবেন! আমি আবগারীর উমেদার নই যে আমার উপর জুলুমবাজি করবেন!

কালী হালদার একেবারে বেত্রাহত সাপের মতো নুইয়া পড়িল··· চারিদিকে চাহিয়া আদিত্যর দু'খানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, —আমাকে মাপ করুন মশায়! দোহাই আপনার! সাহেবের কাছে যাবেন না···ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবো···তবে এবেলায় সুযোগ হবে না···আপিস আছে···আপিসের ফেরত গিয়ে নিয়ে আসবো!··· সত্যি বলছি। মাপ করুন···দোহাই আপনার!

আদিত্য বলিল—আর চিন্তাহরণ বাবুকে যে-সব কথা বলে এসেছেন ?

কালী হালদার সবিনয়ে কহিল—বলুন, তার জন্য কি করতে হবে ?

আদিত্য বলিল—গিয়ে তাঁকে সব কথা খুলে বলা দরকার মনে করছেন না ?

কালী হালদার বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব দরকার। আপিসের পর গিয়ে তাঁকে সব কথা বলে নিজের নাক-কাণ মলে' ক্ষমা চেয়ে আসবো।

আদিত্য বলিল—কিন্তু তিনি সপরিবারে এই আজকের মেলে কলকাতা চলে যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে এ সব কথা তিনি যদি পাঁচজনের কাছে বলেন, তাহলে আমার অবস্থা কি হবে, বলতে পারেন ?

কালী হালদারের দু'চোখ সজল হইয়া উঠিল। জুল্‌জুল্ করিয়া সে শুধু চাহিয়া রহিল আদিত্যর পানে…নির্ব্বাক নিস্পন্দ। অতর্কিত বিপদের আঘাতে সে যেন পাথর বনিয়া গিয়াছে !

আদিত্য দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল…কালী হালদারের সে উদ্ধত ফণা চূর্ণ-বিচূর্ণ…সে একেবারে মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তার মুখে কথা নাই ! মনে হইল, বেচারী কালী হালদারের পক্ষে ত্রিশটা টাকা মাহিনায় এত-বড় দায় বহা কতখানি কঠিন…পয়সার অভাবে নাকানি-চুবানি খাইয়া ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার মতো মনের অবস্থা তার নয়। আদিত্য তা বোঝে। কিন্তু…

হঠাৎ এই স্তব্ধতার মাঝখানে মাথায় ঘোমটা দিয়া শীর্ণমূর্ত্তি এক রমণী আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। বলিল—আমার জন্যই আজ আপনার এতখানি লাঞ্ছনা। কিন্তু…

আদিত্য বুঝিল, রাজেশ্বরী।

গায়ের রঙ ফর্সা।…দুঃখে-কষ্টে সে রঙে কালির ছোপ্ পড়িয়াছে!

আদিত্য বলিল—আপনার নাম রাজেশ্বরী দেবী?

মাথা নাড়িয়া রাজেশ্বরী জানাইল, হাঁ।

আদিত্য বলিল—শিলিগুড়ির দুর্গাচরণ চৌধুরী আপনার শ্বশুর?

রাজেশ্বরী মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

আদিত্য বলিল—আমি দুর্গাচরণ চৌধুরী মশায়ের ছেলে। ছোট ছেলে। আমারি নাম আদিত্য। আমার দাদা আছেন। দাদার নাম মাণিক্য চৌধুরী। তিনি আপনাকে বিবাহ করেছিলেন…শুনলুম। আর তাঁর যে-ছবি দেখেছি আজ সকালে এসে, সেই ছবি দেখে আমি সব বুঝেছি।…দাদা কোথায়…জানি না। আমার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয় …তবু আপনি আমার দাদারস্ত্রী…আমি বেঁচে থাকতে দুর্গাচরণ চৌধুরী মশায়ের পুত্রবধূ পরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে' ছেলেমেয়ে প্রতিপালন করবেন…তা হতে পারে না। পরিচয় যখন পেয়েছি, তখন আমাকে যেমন করে হোক এর ব্যবস্থা করতেই হবে!…

এ-কথা বলিয়া আদিত্য চাহিল কালী হালদারের পানে, বলিল—আপনি ভুল করেছেন…এবং ভুল যে করেছেন, তা আপনি বিলক্ষণ বোঝেন! জ্ঞানতঃই এ-কাজ আপনি করেছেন।…কিন্তু এ ভুলের জন্য যা হয়েছে…তা ভালো কি মন্দ, ভগবান বিচার করবেন। তবে এতকাল যখন সংসারে এঁদের স্থান দেছেন, তখন আরো দু'একদিন দিতে হবে…তারপর আপনার মাথা থেকে এ-ভার আমি আমার মাথায় নেবো। তাতে আপনার চেয়ে এঁরাই বেশী আরাম পাবেন।

চৌদ্দ

যেন ষ্টেজের উপর সুনিপুণ নাট্যকারের লেখা নাটকের একটা দৃশ্য অভিনয় হইয়া গেল! টেম্পো একেবারে ক্লাইমাক্সে উঠিয়াছে! দর্শক থাকিলে করতালিতে শ্রাবণের ধারা বহাইয়া দিত!

হীরোর মতো দৃপ্ত ভঙ্গীতে অভিনয় সারিয়া আদিত্য আসিল ষ্টেশনে।

ট্রেণ এখনো ছাড়ে নাই। ছাড়িতে বিলম্ব বেশী নাই!

ফার্ষ্টক্লাশ রিজার্ভ-কামরায় গিরিবালা বসিয়া আছেন। চিন্তাহরণ নাই। প্লাটফর্ম্মের ওদিকে দাঁড়াইয়া একজন বাঙালী সাহেবের সঙ্গে তিনি কথা কহিতেছেন। আর জাহ্নবী···ঐ যে···সঙ্গে মুকুল আর সীতা।

আদিত্য আসিয়া দাঁড়াইল কামরার সামনে। ডাকিল—মা···

গিরিবালা একটা বাস্কেট টানিয়া গুছাইতেছিলেন···বাস্কেটের মধ্যে একরাশ স্কোয়াশ·· আপেল-নাশপাতি আর সব্জী। ডাক শুনিয়া গিরিবালা যেন চমকিয়া উঠিলেন! চাহিয়া দেখেন···আদিত্য!

তিনি হতভম্বের মতো চাহিয়া রহিলেন...মুখে কথা নাই।

আদিত্য বলিল—আপনার ওখানে গিয়েছিলুম। শুনলুম, আপনারা কলকাতা যাচ্ছেন।

গিরিবালা বলিলেন—হ্যাঁ, বাবা। ওঁর জরুরি তার এলো। সেখানে এখনি না গেলে নয়। তাই হঠাৎ...

আদিত্য বলিল—উনি কোথায়?

গিরিবালা বলিলেন—ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে...শিলিগুড়িতে যাতে গোটা কামরা রিজার্ভ পাওয়া যায়, তারি ব্যবস্থা করতে গেছেন।

—ও...

গিরিবালা চুপ করিয়া রহিলেন। আদিত্য বলিল—একটা কথা বলতে এসেছিলুম, মা...

—বলো...

আদিত্য বলিল—আমার নামে যে-সব কথা উঠেছে...

কথা শেষ হইল না। কামরার সামনে চিন্তাহরণ।

আদিত্যকে দেখিয়া চিন্তাহরণ গর্জ্জিয়া উঠিলেন—যাও। এখানে তোমার থাকবার কোনো দরকার নেই! ইউ উড্ নট্ উয়োরি হার্।

চিন্তাহরণের সঙ্গে ষ্টেশনের দু' একজন কর্ম্মচারী।

আদিত্য চাহিল চিন্তাহরণের দিকে। চিন্তাহরণ কহিলেন—যাও... তোমার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। একদিন আমার এখানে আসতে দিয়েছি...ইওর লাক্...এখন থেকে আমার দোর মাড়াবে না... খবর্দ্দার!

· আদিত্যর দেহে-মনে যেন কে বিছুটির রস ছিটাইয়া দিয়াছে··· তেমনি জ্বালা!···

কামরার কাছ হইতে সে সরিয়া আসিল।

চিন্তাহরণ চাহিলেন গিরিবালার দিকে...কহিলেন—জাহ্নবী কোথায়?

—মুকুলদের সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম্মে নেই?

চিন্তাহরণ চাহিলেন প্ল্যাটফর্ম্মে···চারিদিকে...হাঁ, ঐ যে!

তারপর আবার চাহিলেন আদিত্যর দিকে, বলিলেন—জাহ্নবীর সঙ্গে খবর্দ্দার দেখা করবে না। কোনো কথা নয়। তার সঙ্গে তোমার বিবাহ ক্যান্‌সেল্ করেছি। কলকাতায় গিয়ে জাহ্নবীর বিবাহ দেবো অন্য পাত্রের সঙ্গে। পাত্র মজুত্···বুঝলে?

রাগে আদিত্য জ্বলিয়া উঠিল! বলিল—আই ডোণ্ট্ কেয়ার! আপনি আমার সঙ্গে যে-ব্যবহার করেছেন, তারপর আপনি সেধে যেচে আমার হাতে ধরলেও আপনার মেয়েকে আমি বিবাহ করবো না।

—হোয়াট্! ইউ স্কাউন্‌ড্রেল···চিন্তাহরণের স্বরে যেন বাজের হুঙ্কার!

চীৎকার শুনিয়া দু' চারজন লোক আসিয়া জমিল।

সীন্ ক্রিয়েট করায় আদিত্যর ঘৃণা···আদিত্য নিঃশব্দে সরিয়া গেল।

চিন্তাহরণ ডাকিলেন—নাগিনা···দিদিমণিকে ডেকে আন্...তারপর তোরা গাড়ীতে গিয়ে বোস্···ট্রেণ ছাড়তে বেশী দেরী নেই।

চিন্তাহরণের কথার সঙ্গে সঙ্গে বেল্ পড়িল।

নাগিনা গিয়া ডাকিয়া আনিল জাহ্নবীকে...মুকুল ও সীতা আসিল জাহ্নবীর সঙ্গে।

চিন্তাহরণ বলিলেন জাহ্নবীকে—গাড়ীতে উঠে বসো।

জাহ্নবী উঠিয়া বসিল। তারপর চিন্তাহরণ উঠিলেন গাড়ীর কামরায়।

মুকুল বলিল—শিলিগুড়ি থেকে রিজার্ভের ব্যবস্থা পাকা তো?

—হ্যাঁ।

দূরে দাঁড়াইয়া আদিত্য দেখিল...

মুকুলের সঙ্গে জাহ্নবী কথা কহিতেছিল...মুকুল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ...জাহ্নবী কামরার সীটে বসিয়া। সীতা মুকুলের পাশে...তার কোনো পাত্তাও দুজনে লয়না...সে যেন কে...তার সঙ্গে একটিও কথা নাই। দুজনে এত কি কথা? আদিত্য ভাবিল, গল্পে লেখে ধনিকদের আত্মম্ভরিতা, দর্প-অহঙ্কারের কথা...গরীবকে উহারা মানুষ বলিয়া মনে করে না...তাদের পানে চাহিতেও যেন লজ্জায় মরিয়া যায়, সে-কথা মিথ্যা নয়!

মন বলিল, মূর্খ, তোকে লইয়া জাহ্নবী এতদিন শুধু খেলা করিয়াছে! ...মুকুল কাছে ছিল না তাই সময় কাটাইবার জন্য তোর সঙ্গে একটু অভিনয়! জাহ্নবী তোকে ভালোবাসে না...ঐ অহঙ্কারী বাপের মেয়ে তো! শুধু খেয়াল! খেয়াল হইয়াছিল, তাই...

নহিলে ১৩ই বৈশাখ তার সঙ্গে বিবাহের কথা স্থির...আর তাকে ঠেলিয়া মুকুলকে লইয়াই তার সব!...কথা যা' কিছু, মুকুলের সঙ্গে! আদিত্যর সঙ্গে জাহ্নবী এমন নিবিষ্ট মনে...সকলকে ঠেলিয়া কোনোদিন কোনো কথা বলিয়াছে? ভবিষ্যতে যে গৃহ রচনা করিবে, তার কথা?

ওঃ, বাঁচিয়া গিয়াছে ! এই সব হাই-সোসাইটির সঙ্গে পরিচয় না থাকিলেও ও-সোসাইটির যে-সব গল্প পাঁচজনের মুখে শোনে···ও-লাইফের সম্বন্ধে কল্পনায় যে-সব ছবি ফোটে···

বিবাহ করিয়া শেষে···বাপ্ !

আবার বেল্ বাজিল।

মুকুল সহসা ট্রেণ ছাড়িয়া দ্রুত-পায়ে ওদিকে গেল···আদিত্যর দৃষ্টি ছুটিল মুকুলের পিছনে।

একজন লোক আসিতেছিল···তার হাতে ফুলের বাস্কেট···টাট্‌কা মর্শুমী ফুলে ভরা···লাল নীল হলুদ বেগুনি রঙের অজস্র ফুল।

তার হাত হইতে বাস্কেট লইয়া মুকুল পার্শ খুলিয়া দাম দিল··· তারপর বাস্কেট হাতে তখনি ছুটিয়া আসিল কামরার সামনে।

ট্রেণ বাঁশী বাজাইয়া নড়িয়াছে···

হুমড়ি খাইয়া বাস্কেটটা মুকুল দিল জাহ্নবীর হাতে। মুখে হাসি ···সে-বাস্কেট লইয়া জাহ্নবী বুকে চাপিয়া আবেশে দু' চোখ বুজিল।

তারপর কর-মর্দ্দন···মুকুল কি নিবিড়ভাবে জাহ্নবীর হাত চাপিয়া ধরিয়াছে···সে-হাত যেন ছাড়িয়া দিবে না !

ট্রেণ চলিল।···জাহ্নবীর হাত নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া মুকুল ছুটিয়াছে ট্রেণের সঙ্গে।

আদিত্য ভাবিল, পড়ে না হোঁচট্ খাইয়া ঐ চলন্ত ট্রেণের চাকার তলায় !

পড়িল না। হাত ছাড়িয়া মুকুল দাঁড়াইয়া পড়িল প্ল্যাটফর্ম্মের প্রান্তে ···হাতে রুমাল···ট্রেণের পানে চাহিয়া রুমাল নাড়িতে লাগিল···যেন

তার পৃথিবী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! ওদিকে কামরার জানলা দিয়া মাথা গলাইয়া এদিকে চাহিয়া জাহ্নবী···সে-ও হাতের রুমাল নড়িতেছে···যেন প্রেমের পতাকা!

···আর সীতা?

প্ল্যাটফর্ম্মে আদিত্য যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে দাঁড়াইয়া অবাক নেত্রে চাহিয়া আছে···ট্রেণের পানে।

জাহ্নবী কি আদিত্যকে দেখে নাই? নিশ্চয় দেখিয়াছে!···একটা চাহনি নিক্ষেপ করিয়া এতদিনের পরিচয়টুকুকে স্বীকার করিতে পারিত··· তাও করিল না! যাক···জাহ্নবীকে কে চায়! জাহ্নবীকে না পাইয়া এতকাল যদি আদিত্যর চলিয়া থাকে...ভবিষ্যতেও চলিবে!

মনে মনে পণ করিল, এই সব ব্যাপার লইয়া···একদিকে ধনিকের স্পর্দ্ধা, অহঙ্কার আর মূঢ়তা···আর একদিকে গরীব-দুঃখীর মনের বিশালতা···উদারতা! অত প্রাচুর্য্যের মধ্যেও ধনিকের কি-অভাব··· কতখানি দুঃখ...অর্থাভাব-অনটনের মধ্যেও গরীব-দুঃখীর মনে কি ঐশ্বর্য্য-সম্পদ...কি গভীর শান্তি! সে-উপন্যাস লিখিয়া সকলকে যখন বিমুগ্ধ-বিমোহিত করিয়া দিবে. তখন ঐ মুকুল-ব্যারিষ্টারের ঘরে বসিয়া কি সুখ তুমি ভোগ করিতেছ, দেখিয়ো জাহ্নবী!

ট্রেণ চলিয়া গেল। যাত্রীদের বিদায়-সম্ভাষণ করিতে যারা আসিয়াছিল, তারা ফিরিতেছে। আদিত্য শুধু কাঠ হইয়া একটা লোহার থামের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। চোখের দৃষ্টি ঐ তেল-কালিমাখা রেল-লাইনের উপর নিবদ্ধ।

সীতা আর মুকুল ফিরিতেছিল···

সীতা বলিল—আপনি কখন এলেন আদিত্য বাবু?

আদিত্য বলিল—এই খানিকক্ষণ।

—ওদের সঙ্গে কৈ, দেখা করলেন না তো!

আদিত্য বলিল—না।

সীতা বলিল—আপনি এখানে থাকবেন? না...

আদিত্য বলিল—আমি কিছুদিন থাকবো।

তারপর একটা কথা মনে হইল, বলিল—একখানা উপন্যাস সুরু করেছি...এইখানে বসে সেখানা শেষ করে ফিরবো। এখানকার atmosphere কিনা!

বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় সীতার মন ভরিয়া উঠিল। সীতা বলিল—প্লটটা আমাকে বলবেন না?

আদিত্য বলিল—আগে বললে আপনার আর পড়া হবে না!... বই ছাপা হলে দেবো'খন।

সীতা বলিল—নিশ্চয় দেবেন তো? আমি পড়বো। লেখকের উপহার-দেওয়া বই...তার কত আদর! জানেন না তো বই আমি কি রকম ভালোবাসি! দাদা আমায় বলে, বইয়ের পোকা!...

হাসিয়া আদিত্য বলিল—সর্ব্বনাশ! তাহলে আপনি বইয়ের শত্রু! বই কেটে দেবেন!

সীতাও হাসিল, হাসিয়া বলিল—নষ্ট করে কাটা নয়...কিনে কিনে বইয়ের এডিশন্ কাটিয়ে দি! বই নিয়েই আমায় বেঁচে থাকা!

মুকুল একটু দূরে কথা কহিতেছিল...এক সুবেশা তরুণীর সঙ্গে।

মা-বাপ ভাইবোনকে লইয়া তরুণী আসিয়াছিল কোন্ যাত্রীকে সী-অফ্ করিতে!

তারা চলিয়া গেলে মুকুল ডাকিল—সীতা...

সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়িল আদিত্যর উপর। বলিল—এই যে, আদিত্য বাবু!

—হ্যাঁ।

—আপনি আসতে দেরী করেছেন...দেখা হলো না তো?

আদিত্য বলিল—না।

—এখানে আর ক'দিন আছেন আপনি?

আদিত্য বলিল—ঠিক বলতে পারি না...তবে দিন দশ-পনেরো তো বটেই!...আপনারা?

মুকুল বলিল—আমরা আর পাঁচ-সাতদিন আছি। তারপর...

—ও...

আদিত্য মনে-মনে হিসাব কষিল।...আজ চৈত্র মাসের ২৯ তারিখ ...এ-মাসের আর দু' দিন···তারপর বৈশাখের পাঁচ-সাত তারিখ! ওদিকে ১৩ তারিখ তাহা হইলে হাতে রাখিয়াই ফিরিবে।

বলিল—আচ্ছা, আসি···

মুকুল বলিল—গুড্ আফটার-নুন্···

সীতা বলিল—নমস্কার আদিত্য বাবু। আছেন যখন, দেখা হবে।

হাসিয়া আদিত্য বলিল—নিশ্চয়···এ-পৃথিবী খুব বড় নয় তো! নমস্কার!

পনেরো

মুকুল-সীতা চলিয়া গেল।

আদিত্য প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়া পথে নামিল।

মনে হইল, পৃথিবী যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে!

হঠাৎ যেন কে মনকে চাবুক মারিল! বলিল, কোনো কাজ নাই? গল্পে-উপন্যাসে এমন হইলে নায়ককে চাবুক মারিয়া সচেতন করিয়া তুলিতে, না, প্রেমের নৈরাশ্যে কাতর করিয়া তাকে পাহাড় হইতে ঝাঁপ খাওয়াইতে?...একটু আগে চিন্তাহরণের সহিত তুলনা করিয়া নিজেকে তার চেয়ে অনেক বড় বলিয়া মনে-মনে খুব তো আস্ফালন ফলাইতে-ছিলে! আর যেই জাহ্নবী চলিয়া গেল...তা'ও উপেক্ষা করিয়া...তোমার পানে চাহিল না...অমনি পৃথিবী শূন্য হইয়া গেছে ভাবিয়া তুমি আকুল?

না...না...না!

তোমার এই প্রেম-বিলাসের নৈরাশ্য এত বড় যে তার বেদনায় তুমি আর মাথা তুলিতে পারিবে না? ভাবো ঐ অভাগিনী রাজেশ্বরীর

কথা ! কি বিশ্বাসে...বিধবা সে...সমাজ আত্মীয়-স্বজন···কারো কথা না ভাবিয়া তোমার সহোদর মাণিক্যকে নির্ভর করিয়াছিল ! বিবাহের কথা শুধু নয়···বিবাহ হইয়া গিয়াছিল ; এবং সে-বিবাহের পর বেচারী নিজেকে মাণিক্যর হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল ! নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার মনে কতখানি আশ্বাস...কতখানি বিশ্বাস লইয়া ! সে-বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দুটি ছেলেমেয়ের ভার মাথায় চাপাইয়া মাণিক্য চম্পট দিয়াছে ...আর রাজেশ্বরী ? এতখানি হীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াও পাহাড় হইতে পড়িয়া প্রাণ দেয় নাই···পরের লাথি-ঝাঁটা অঙ্গে মাখিয়া বাঁচিয়া আছে !

চিঠিতে লিখিয়াছে, এ দুঃসহ অপমান সহিয়া সে বাঁচিয়া আছে... শুধু ঐ দুটো ছেলেমেয়ের মুখ চাহিয়া...তাদের জন্য !···

বেচারী !

বেদনায় মন টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। কত গভীর বেদনা !·· এ বেদনার নীচে তার নৈরাশ্যজনিত বেদনা কোথায় চাপা পড়িয়া গেল !

আদিত্য ঠিক করিল, তাই···

সে চলিতে স্বরু করিল। প্রথমে আসিল হিল-ভিউয়ে···ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিল। বলিল—একটু বিপদে পড়েছি···আপনার সাহায্য চাই ম্যানেজার বাবু।

ম্যানেজার ভ্রূভঙ্গী-সহকারে চাহিল। কালী হালদার আসিয়া যে-পালা অভিনয় করিয়া গিয়াছে···তারপর ছেলেমেয়ে দুটোকে ফেলিয়া যাওয়া...ম্যানেজার বাবুর বয়স হইয়াছে...এ-বয়সে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন। কৌতূহলে, তাঁর মন ভরিয়া

উঠিল। তিনি বলিলেন—বলুন···আমার সাধ্যের অতীত না হয়, ···সাহায্য করবো...যতখানি সম্ভব।

আদিত্য বলিল—ঐ যে দুটি ছেলেমেয়ে ওরা দিয়ে গেছে···ও-দুটি আমার দাদার ছেলে-মেয়ে। সহোদর ভাই, তাঁরি। দাদা ব্যবসাতে লোকশান দিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ...দাদার স্ত্রী বেচারী দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ীতে হাঁড়ি ঠেলছে, বাসন মাজছে। আমি এসেছি জানতে পেরে ওঁরা আমার ঘাড়ে ও-দায় চাপিয়ে দিতে চান। ন্যায়তঃ আমার এ-দায় নেবার কথা নয়···কিন্তু ন্যায়ের উপরে আর একটা জিনিষ আছে ম্যানেজার বাবু,···মমতা···মায়া! কাজেই এ-দায় আমি নেবো। তাই···

এক-নিশ্বাসে এতখানি বলিয়া আদিত্য চাহিল ম্যানেজার বাবুর দিকে।

ম্যানেজার বাবু বলিলেন—বলুন...

আদিত্য বলিল—এখনি তো সকলকে নিয়ে কলকাতায় ফিরতে পারি না...দু' দশ দিন এখানে আমাকে থাকতে হবে। থেকে সব দিক বিবেচনা করে' তারপর পাকা ব্যবস্থা। তাই মানে, আমার ঘরের সঙ্গে লাগাও আর-একখানি যে ঐ ছোট ঘর...ও-ঘরখানিও আমার চাই। দাদার স্ত্রীকে ও-বাড়ীতে লাথি-ঝাঁটা খাওয়াই কেন? আপনার জন.. তায় নিরুপায় অসহায় স্ত্রীলোক!

ম্যানেজার বাবু ভাবিলেন, দাঁও যদি পাওয়া যায়, মন্দ কি? ও-ঘরে হাবুড়ি-জাবড়ি কতকগুলা জিনিষ আছে বৈ তো নয়...ভাঙ্গা অব্যবহার্য্য যত ফার্ণিচার!

মুখে বলিলেন—কিন্তু ও ঘর তো দেবার নয় আদিত্য বাবু!

—কেন ?

—ও-ঘরে আজেবাজে জিনিষ রয়েছে। সে-সব আমি রাখি কোথায় ?

—ব্যবস্থা করতে পারেন না ? বড় ঘর নেবার মতো সামর্থ্য আমার নেই।

ম্যানেজার বাবু বলিলেন—কিন্তু…

আদিত্য বলিল—তাহলে আমাকে অন্য কোথাও শস্তার বাসা দেখতে হয়। আর কোথাও না পাই, ভুটিয়া-বস্তীতে…

ম্যানেজার বাবু ভাবিলেন, তাহা হইলে এ-ঘরটা যায়! এখন ওদিকে কাছারি-অফিস সবই খোলা…মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকের পক্ষে এখন দার্জ্জিলিঙে আসিবার সম্ভাবনা নাই। বড়লোকরা শুধু আসেন…তাঁরা এ-হোটেলে কেন আসিবেন ? যতক্ষণ ওদিকে নামজাদা হোটেলে ঘর পাওয়া যায়, সুখ-সুবিধা যতই জোগানো হোক…নামজাদা হোটেল না হইলে তাঁদের দার্জ্জিলিঙে আসা মিথ্যা! লোকের কাছে বলিতে কতখানি লজ্জা…মানব-প্রকৃতিতে অভিজ্ঞ ম্যানেজার বাবু এ-সব তত্ত্ব ভালো করিয়াই জানেন!

তাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বলিলেন—আপনি ভুটিয়া-বস্তীতে থাকতে পারবেন না। তার চেয়ে…যেমন করে পারি আমি ব্যবস্থা করে দেবো। আমার এখানে এসেছেন...কোথায় আবার যাবেন দু' দশ দিনের জন্য!

আদিত্য বলিল—তাহলে দয়া করে আজই ব্যবস্থা করে দিন। কাল সকালে আমার দাদার স্ত্রীকে আমি এখানে আনতে চাই। তাঁর জন্য

ঘর নিলে আমার মাইনে যা চ্ছ, তার চেয়ে খরচ কম পড়বে!' তাছাড়া ঐটুকু বাচ্ছা ছেলেমেয়ে.. মাকে ছেড়ে তাদের আমি কি ভরসায় রাখবো! আমাকে চেনে না। কখনো দেখেনি।

ম্যানেজার বাবু বলিলেন—বেশ...তাই হবে। কালই আপনি তাঁকে আনবার ব্যবস্থা করুন তাহলে!

আদিত্য বলিল—আপনাকে ধন্যবাদ!

আদিত্য আসিল কালী হালদারের গৃহে। কালী হালদার বা সুরথ কাহারো দেখা পাইল না। দুজনেই অফিসে গিয়াছে।

আদিত্য রাজেশ্বরীকে ডাকাইল।

চিরকুট্ পরিয়া রাজেশ্বরী বাসন মাজিতেছিল। আসিয়া আদিত্যকে সে বসাইল সামনের দিককার ঘরে...দড়ির একখানা মোড়া আনিয়া সেই মোড়ায়।

আদিত্য বসিলে রাজেশ্বরী মলিন মুখে একান্ত দীন কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বুঝি, দাঁড়াইয়া জীবন-গ্রন্থের পাতাগুলা সে দেখিয়া লইতেছিল। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া লাভ নাই...ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

দু' মিনিট চুপ করিয়া আদিত্য কি যেন ভাবিল। যাহা করিবে, মনে মনে ঠিক করিয়াই আসিয়াছে...তবু কোথা হইতে কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবে, ভাবিয়া তাহাই ঠিক করিয়া লইল!

আদিত্য বলিল—আমাকে আপনি চেনেন না। আমার দাদাকে যেমন চিনেছেন, সে-চেনার ওপর নির্ভর করলে আমাকে বিশ্বাস করা শক্ত হবে। তবু.... এ-কথা বিশ্বাস করুন, দাদা যে-অন্যায় করেছে,

যথাসাধ্য সেটুকুর প্রায়শ্চিত্ত আমি করবো। তবে আমার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। চাকরি নেই। ভাগ্যের ওপর নিত্য দিন নির্ভর রাখতে হয়। ভাগ্য যখন যেমন জোটায়! অনেক সময় এমন হয় যে কিছুই জোটে না।

কথাগুলো রাজেশ্বরীর কাছে হেঁয়ালির মতো মনে হইল। সাগ্রহে সে আদিত্যর পানে চাহিয়া রহিল···মুখে কথা নাই!

আদিত্য বলিল—ওখানে আপনার থাকা সম্ভব নয়।

রাজেশ্বরীর বুকখানা দুলিয়া উঠিল···করুণ কণ্ঠে সে কহিল—না।

—ধরুন্, আমি যদি মাসে মাসে কিছু করে টাকা পাঠাই?

রাজেশ্বরী চারিদিকে চাহিল···সতর্ক দৃষ্টিতে। তারপর কণ্ঠ খুব মৃদু করিয়া বলিল—তাতে ছেলে মানুষ করতে পারবো না। এখানকার রীতিই আলাদা। সে আপনি আঁচ করতে পারবেন না!

রাজেশ্বরী চুপ করিল। আদিত্য শুনিল রাজেশ্বরীর কথা। কোনো জবাব দিল না। কি ভাবিতেছিল! হয়তো ভবিষ্যতের কথা!

আদিত্যকে নিরুত্তর দেখিয়া রাজেশ্বরী বলিল—আপনার রান্নাবান্না করবার জন্য বামুন আছে তো···বাসন-কোসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা ··এ-সবের জন্য চাকর? আমি আপনার রান্নাবান্না থেকে ঝাঁট-পাট দেওয়া···সব কাজ করে দেবো। উচ্ছিষ্ট ফেলা যায়···তাই খাবো। এতে আপনার যে খরচটুকু বাঁচবে, তার চেয়েও যাতে কম খরচে চলে, আমি দেখবো। দয়া করে আমায় সঙ্গে নিয়ে চলুন।

আদিত্যর বুকের উপর যেন বজ্রপাত হইল। বুকের মধ্যে যা কিছু ছিল, সে-আঘাতে সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া দুমড়াইয়া একশা! বুঝিল, কত

দুঃখ পাইলে, কতখানি অসহায় নিরুপায় হইলে মানুষের মুখে এমন কথা বাহির হয়! বুঝিয়া তাই সে বলিল—বেশ...কিন্তু মুস্কিল, কি জানেন? আমি থাকি কলকাতার এক মেশে। মাঝে মাঝে দু' তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়ে। আমার রোজগার নিয়মিত নয়। তাঁরা দয়া করে' বাড়ী-ভাড়ার জন্য তাগাদা দেন না। ভাড়া আমি অবশ্য শোধ করি। এটুকু বিশ্বাস তাঁদের হয়েছে যে আমি ভাড়া মেরে পালাবো না, তাই ভাড়া না দিতে পারলে তাড়িয়ে দেন না। আমার নিজের দশা এমন বলেই ভাবছি, কি উপায় করবো!

রাজেশ্বরী বলিল,—মেশে তাঁরা চাকর রাখেন তো···আমি যদি সেই চাকরের কাজ করি?

আদিত্যর বুকখানা ধ্বক্ করিয়া দুলিয়া উঠিল। সে বলিল—আপনি আমার দাদার স্ত্রী। যতদিন চিনিনি, জানিনি, কথা ছিল না। কিন্তু এখন জেনে-শুনে আমি বেঁচে থাকতে আপনি করবেন পাঁচজনের দাসীর কাজ!

রাজেশ্বরীর দু'চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সজল কণ্ঠে সে বলিল,—ভগবান যদি কপালে তাই লিখে থাকেন, উপায় কি!

তারপর দু' সেকেণ্ড চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—ও-দাসীবৃত্তিও অনেক ভালো। এখানে যেভাবে বাস করছি···কত অকথা-কুকথা শুনতে হয়···তা শুনেও আত্মঘাতী হতে পারিনি, শুধু ঐ বাচ্ছা দুটোর মুখ চেয়ে! ওরা অনাথ হবে, তাই।

কথা থামিল অশ্রুর উতল উচ্ছ্বাসে! রাজেশ্বরীর দু'চোখে জলের ধারা। রাজেশ্বরী আঁচলে চোখ মুছিল।

আদিত্য বলিল—আমি ভাবছিলুম, কলকাতায় কারো বাড়ীতে যদি তু'খানা ঘরও পাই···তারপর···একটু পরিশ্রম করবো...যদি একটা টুইশনি নিই···তা থেকে ঘরের ভাড়া হয়ে যাবে'খন !···বেশ, তাই হবে। তাহলে আপনি ঠিক করে ফেলুন···আমার সঙ্গেই আপনি যাবেন।

চোখের উপর হইতে আঁচল সরাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে রাজেশ্বরী বলিল—কবে আমার মুক্তি মিলবে, জানতে পারি ?

আদিত্য চাহিল রাজেশ্বরীর পানে···তুটি চোখ অশ্রুতে রাঙা হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে···মুখে কালির রেখা !

আদিত্য বলিল—যদি বলি একটা রাত কোনোমতে এখানে থাকুন ···কাল আমি এসে আমার হোটেলে আপনাকে নিয়ে যাবো ? হোটেলে আর একখানি ঘর ঠিক করেছি···পাশের ঘর। তারপর কলকাতায় যেতে দিন দশ-বারো দেরী হবে। সেখানে চিঠি লিখে ব্যবস্থা করতে যেটুকু বিলম্ব !···গিয়ে প্রথমে বোধ হয় আমার মেশেই উঠতে হবে। সেখানে তো কেউ ফ্যামিলি নিয়ে থাকে না···পাঁচ-রকম লোক বাস করে।

রাজেশ্বরী বলিল—আমার তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। এখানে যেভাবে তিলে-তিলে দগ্ধ হচ্ছি...

আদিত্য বলিল—বেশ, তাহলে এই কথা···কাল এসে আপনাকে নিয়ে যাবো···কেমন ? হ্যাঁ, ছেলেমেয়েরা ভালোই আছে...তাদের জন্ত আপাততঃ একজন দাই রেখেছি।

কৃতজ্ঞতায় রাজেশ্বরী একেবারে ভাঙ্গিয়া গলিয়া পড়িল...নীচু হইয়া আদিত্যর পায়ের ধূলি লইতে গেল।

শশব্যস্তে সরিয়া গিয়া আদিত্য বলিল—আপনি করেন কি! সম্পর্কে আপনি আমার গুরুজন হন্…বৌদি!

বৌদি!

এ-কথায় কি আরাম...কতখানি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-মমতা-প্রীতি!… মাথা ঘুরিয়া রাজেশ্বরী পড়িয়া যাইতেছিল…আদিত্য তাকে ধরিয়া ফেলিল।

আদিত্যর গায়ে ভর দিয়া রাজেশ্বরী নিজেকে সুদৃঢ় করিল…তারপর সরিয়া দাঁড়াইল। মুখে হাসির রেখা ফুটিল। কতদিনকার সঞ্চিত পুঞ্জিত মেঘের বুকে সে-হাসি যেন বিদ্যুতের ঝলক! রাজেশ্বরী বলিল —ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, ঠাকুরপো!

ষোল

হোটেলে ফিরিয়া আদিত্য দু'তিনখানা চিঠি লিখিল।

প্রথম চিঠি মেশের ম্যানেজার উমেশ বাবুকে। লিখিল,

দাদা

এখানে আসিয়া অবধি এমনি ভাগ্য-বিপর্যয় চলিয়াছে, যে সে-সকল কথা শুনিলে আপনি অবাক হইবেন। এমন সব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, যে ঘটনার কথা গল্পে-উপন্যাসে বা এখনকার থিয়েটারী নাটকেও দেখা যায় না। সে সব কথা ওখানে গিয়া বলিব।

এখন আমার বিশেষ দুটি নিবেদন আছে।

প্রথম নিবেদন,—আমার বৌদির সঙ্গে এখানে দেখা হইয়াছে। দাদা নিরুদ্দেশ— দুটি ছেলেমেয়ে লইয়া বৌদি অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছেন। বাঁচিয়া থাকিয়া তাঁকে যদি এ সমুদ্র হইতে উদ্ধার না করি, তাহা হইলে পরে নরকেও আমার স্থান হইবে না। ওঁদের লইয়াই কলিকাতায় ফিরিব। ফিরিতে সাত-আট দিন দেরী হইবে। আপনি ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করিবেন, ওখানে গিয়া পাঁচসাত দিন আমার বৌদি যাহাতে ও-বাড়ীতে একটু আশ্রয় পান! তারপর দেখিয়া শুনিয়া আলাদা বাসা লইতেই হইবে। আপনার স্নেহ স্মরণ করিয়া এ-ভার আপনাকে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

দ্বিতীয় নিবেদন—যে-ভাড়া আমার বাকী পড়িয়াছে, সে-ভাড়া শোধ দিবার জন্য আমাকে আরো দু'মাস সময় দিবেন এবং চল্‌তি মাসের ভাড়ার জন্যও তাগিদ দিবেন না।

জানি, আপনার অনেক অসুবিধা হইবে, কিন্তু আমার নিরুপায়তার কথা ভাবিয়া আমার এ-অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

আশা করি, বৌদি ভালো আছেন। বৌদির জন্য এখান হইতে কিছু উপহার লইয়া যাইব। সে-উপহার তাঁর ভালো লাগিবে।

আপনি আমার প্রীতি-নমস্কার জানিবেন। ইতি

স্নেহের আদিত্য

ভবিষ্যৎ

দু'নম্বর চিঠি লিখিল একজন পাবলিশারকে। লিখিল,—

প্রিয় সুধীর বাবু

এখানে আসিবার পূর্ব্বে যে বড় উপন্যাস লিখিয়া আপনাকে প্রকাশের জন্য দিব বলিয়াছিলাম তার ষোল ফর্ম্মা লিখিয়া শেষ করিয়াছি। আরো ষোল ফর্ম্মায় শেষ হইবে। যেমন কথা হইয়াছিল, তিন খণ্ডে না হোক দু' খণ্ডে উপন্যাসখানি ছাপাইলে ভালো হয়।

উপন্যাসের লেখা আপনার ভালো লাগিবে। আমাদের সমাজের নানা স্তরের নর-নারীর ছোট-বড় সুখ-দুঃখের কথা লইয়া উপন্যাস লিখিতেছি। আমাদের জীবন কি করিয়া পাঁচজনের সঙ্গে মেলায়-মেশায় গড়িয়া ওঠে, বর্ত্তমানের উপর দিয়া কিভাবে ভবিষ্যতের পথ করিয়া চলে...অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্ট অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া ওঠে... তার বেশ মনোজ্ঞ কাহিনী হইবে। নিজের লেখা বলিয়া অহঙ্কার করিতেছি না, যাহাকে বলে, বুকের রক্ত দিয়া লেখা...ঠিক সেইভাবে এ-উপন্যাস লিখিতেছি।

আপনাকে কপি-রাইট বেচিতে চাই। যে-দাম আপনি ন্যায্য বলিয়া মনে করিবেন, দিবেন। আমি জানি, আপনি অবিচার করিবেন না।

আরো দশ-পনেরো দিন পরে ফিরিব—একেবারে উপন্যাস কমপ্লীট করিয়া। এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে,—আমার উপর যদি বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আমার এ চিঠি পাইবামাত্র দয়া করিয়া মনি-অর্ডার করিয়া কিম্বা ইন্সিওর-ডাকে দুই শত টাকা পাঠাইয়া দিবেন। টাকার অভাবে আমি এখানে বিপন্ন।

যদি বাঁচিয়া থাকি, দশ-বারো দিন পরে উপন্যাস দিয়া আপনার এ ঋণ শোধ করিব।

আশা করি, সপরিবারে ভালোই আছেন। আপনার দয়া আমাকে বহু বিপদে উদ্ধার করিয়াছে—আমার মান-ইজ্জৎ বহুবার আপনি রক্ষা করিয়াছেন। সেই ভরসায় বড় আশায় আপনার কাছে হাত পাতিয়া প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আমার প্রীতি-নমস্কার জানিবেন। ইতি

স্নেহানুগত

শ্রীআদিত্য চৌধুরী

তিন নম্বর চিঠি লিখিল "সংনাম" সম্পাদককে। লিখিল,—

একটি গল্প পাঠাইতেছি ভি-পি পোষ্টে। নিরুপায় হইয়াই ভি-পি করিলাম। টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন। এ গল্পের জন্য পঁচিশ টাকা আমার চাই। আশা করি ভি-পি লইয়া টাকা দিতে কার্পণ্য করিবেন না।

গল্পের প্রুফ যদি দশ দিনের মধ্যে রেডি হয়, এইখানে পাঠাইবেন। নচেৎ ওখানে গিয়া প্রুফ দেখিয়া দিব।

আশা করি, খবর ভালো। গ্রাহকদের টাকা ছড়-ছড় করিয়া আসিতেছে তো... শ্রাবণের ধারার মতো?

উইশ্ ইউ অল্ লাক্। ইতি

আপনাদের

আদিত্য চৌধুরী

চিঠিগুলা ডাকে ছাড়িয়া হোটেলে ফিরিল।

ফিরিয়া বারান্দায় ইজি-চেয়ারে দেহ-ভার প্রসারিত করিয়া দিল। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, পাহাড় আর পাহাড়। ওদিকে মণ্ডিত-শির কাঞ্চনজঙ্ঘা...মাথায় তুষারের মুকুট...সে-তুষারে অপরাহ্নের স্নিগ্ধ রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে...মুকুটে কে যেন সোনার পালিশ মাখাইয়া দিয়াছে!...হোটেলের বাহিরে ঢালু পথ নীচের দিকে কোথায় নামিয়া গিয়াছে...পাইন-ঝাড় ভেদ করিয়া। নীচে দেখা যাইতেছে কতকগুলা বাংলো-বাড়ী...ব্রাকেটের পর ব্রাকেটে রাখা যেন খেলার ঘরবাড়ী। রঙ-বেরঙের পোষাক পরিয়া কত জাতের নর-নারী পথে চলিয়াছে! সকলের মন হাল্কা স্বচ্ছ...তার মতো ভবিষ্যতের একখানা ভারী কালো

পাথর কাহারো বুকে চাপিয়া বসে নাই! এ পাথরের চাপে তার প্রাণটা যেন ছেঁচিয়া বাহির হইয়া যাইবে!

মাথার মধ্যে এলোমেলো নানা চিন্তা···যেন একরাশ ভীমরুল আসিয়া মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে···যেমন তাদের ভন্‌ভনানি, তেমনি হুলের জ্বালা! সে-সব চিন্তার মধ্য হইতে সবলে মনকে উপড়াইয়া ছিঁড়িয়া কোনো মতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে আনিল···একান্তে··· একেবারে নিজের নাগালের মধ্যে। মনকে প্রশ্ন করিল, এখন এ আঁধার পারাবার পার হইব কি করিয়া? ডুবিয়া মরিব না, নিশ্চিত। মানুষের প্রাণ বড় কঠিন···সহজে ভাঙ্গে না, ঝরিয়া যায় না। ভাঙ্গিয়া জীর্ণ হইলেও সেই প্রাণের বোঝা বহিয়া মানুষকে বাঁচিতে হয়। আর বাঁচিতে হয় সেই প্রাণকে জোড়াতালি দিয়া খাড়া করিয়া! এমন নড়-বড়ে প্রাণের ভার বহিয়া লাভ কি! শুধু যাতনাই সার হইবে।

মন বলিল, প্রাণটাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে হইলে সব-আগে চাই টাকা···টাকা নহিলে এক পা চলিবার উপায় নাই! সে-টাকা পাইবার একমাত্র উপায়···লেখা!···আর কোনো দিকে মাথা খাটাইবার শক্তি যখন নাই, ঐ পথ অবলম্বন করো। পাবলিশার সুধীর বাবুকে তো চিঠি লিখিয়াছ···গোটা উপন্যাসের ষোল ফর্ম্মা লিখিয়া কম্‌প্লীট করিয়াছ!···অথচ মনে-জ্ঞানে জানো, তার একটি লাইন এখনো লেখো নাই! তার কি হইবে? আর কথা নয়! ষোল ফর্ম্মা···যার নাম ষোল-ষোল দুশো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা···তাও ছাপার অক্ষরে!

মন তাড়া দিল···বিষম তাড়া। এবং সে-তাড়ায় আদিত্য বুঝিল, ইঞ্জিনিয়ারে পড়িয়া নিসর্গ-দৃশ্য উপভোগ করিবার ভাগ্য সে করে নাই।

তার ভাগ্য ঠিক কলিকাতা সহরের ছ্যাকড়া-গাড়ীর ঘোড়ার মতো! দুপাশে জোতা···লাগাম আঁটা! সারাক্ষণ গাড়ী টানিতে হইবে, নহিলে দানা-পানি মিলিবে না!

নিশ্বাসের বোঝায় বুক আরো ভারী হইয়া উঠিল। আদিত্য উঠিয়া ঘরে আসিল।

টেবলের ড্রয়ারে ছিল বাঁধানো লাইন-টানা মোটা খাতা। সেই খাতা খুলিয়া ফাউণ্টেন-পেন লইয়া লিখিতে বসিল।

প্রথমেই লিখিল, উপন্যাসের নাম···ভবিষ্যৎ! বেশ গোটা-গোটা মোটা অক্ষরে! তার নীচে ধরিয়া-ধরিয়া লিখিল···

শ্রীআদিত্য চৌধুরী প্রণীত

তারপর আর-একখানা পাতা খুলিয়া লিখিল, প্রথম পরিচ্ছেদ···

এবার?

খোলা খড়খড়ি দিয়া চাহিল বাহিরের দিকে···সেই পাহাড়! পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সাজানো বাড়ী-ঘর! কুয়াশার বাষ্পে কাঞ্চন-জঙ্ঘার তুষার-ধবল শির ঢাকিয়া গিয়াছে! অথচ এদিকে আকাশভরা রৌদ্র···দূরে চায়ের বন···যেন সবুজ রঙের রাশীকৃত চাপ্‌ড়া!··· ওদিককার ঘরে গ্রামোফোন রেকর্ডে বিলাতী সুর বাজিতেছে··· আনন্দের সুর। এত আনন্দ···ইহারা কোথায় পাইল? হায়রে, মানুষ হইয়া না জন্মিয়া সে যদি পাহাড় হইত! ঐ পাহাড়ের একখানা পাথর···কিম্বা একটা পাইন গাছ, তাহা হইলে কি আরামেই না থাকিত!

কিন্তু না···এ-সব চিন্তা মিথ্যা। উপন্যাস লিখিতে হইবে!

উপন্যাসের নাম দিয়াছে···ভবিষ্যৎ···কিন্তু লিখিবে কি? ভবিষ্যৎ আগাগোড়া অন্ধকারে ঢাকা! চোখে কোথায় সে-দৃষ্টি...কোথায় সে আলো···যে দৃষ্টিতে যে-আলোয় ঐ অন্ধকার ঠেলিয়া ভবিষ্যতের খানিকটা অন্ততঃ দেখিয়া লইতে পারে!

মনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল জাহ্নবী···তার পিছনে চিন্তাহরণ··· গিরিবালা···মুকুল পর্য্যন্ত। মুখে-চোখে অজস্র কৌতুক···যেন দেখিতে চায়, কোথা হইতে আদিত্য কি লেখা সুরু করে! কিসের ভবিষ্যৎ?

মন বলিল, এত কিসের চিন্তা! লেখো নিজের জীবনের কথা! মেসের ঘরে পড়িয়া গল্প-উপন্যাস লিখিয়া কোনোমতে দিনাতিপাত করিতেছিলে·· হঠাৎ একদিন জাহ্নবীর মোটরে ধাক্কা খাইয়া পথে পড়িয়া গেলে! তারপর যা-যা ঘটিয়াছে···তার উপর খেয়ালের বশে জাহ্নবীর মমতা-মায়া·· বিবাহের সখ···এবং সেই আশায় ভর করিয়া আদিত্য আসিয়াছে দেবদুর্লভ স্থান···এই দার্জ্জিলিঙে। এখানে আসিয়া দেখিল জাহ্নবীর পাশে মুকুলকে! তারপর ঐ কালী হালদার···এই রাজেশ্বরী···রাজেশ্বরীর দুই ছেলেমেয়ে। যা ভাবিয়া আসিয়াছিল, সব গেল ভাঙ্গিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া!

ইহার পর?···

জীবনে কি ঘটিবে, কে জানে! তবে ইহার পরে কল্পনার রথ ছুটাইয়া দাও, অদৃশ্য জগতে কিছু যদি আবিষ্কার করিতে পারে···মন্দ কি! উপন্যাসের মতো··

ভবিষ্যৎ

নিজের জীবনে সত্য যা ঘটিবে, তার সঙ্গে কল্পনার কোথাও মিল থাকিবে না, তবু···নিজের সম্বন্ধে নূতন একটা ভবিষ্যৎ...

সেই ভালো!

আদিত্য লিখিতে সুরু করিল···

নায়কের নাম দিল প্রভাকর। প্রভাকর থাকে কলিকাতায় জীর্ণ মেসের একতলায় স্যাঁতানে ঘরে···আসবাবের মধ্যে একখানা ক্যাওড়া কাঠের তক্তাপোষ। তক্তাপোষের উপর পাতা জীর্ণ শয্যা এবং সেই শয্যায় বসিয়া প্রভাকর লেখে গল্প-উপন্যাস।

লেখে ভালোই! লোকে পড়িয়া বলে, খাশা লেখা! আদর কেন মিলিবে না! সে তো রঙ দিয়া অবাস্তব যা-তা কিছু লেখে না! সে লেখে তারি মতো গরীব-দুঃখীর দিন কি ভাবে একটির পর আর একটি কাটিয়া যায়! আজিকার দিনের ঘটনার সঙ্গে কালকার দিনের ঘটনার কোথাও মিল নাই···নিত্য নব-নব ঘটনায় কতখানি বৈচিত্র্য! যারা পড়ে, তাদের জীবন নিত্য একই ধারায় বহিয়া চলে···তাহাতে বৈচিত্র্য নাই! তাই আদিত্যের লেখা নর-নারীর জীবনের বৈচিত্র্যে সকলে অভিভূত হয়···তাই তাদের ভালো লাগে! মানুষ বৈচিত্র্য চায় ···সে বৈচিত্র্য পাঠক পায় তার লেখায়! কাজেই···

মা-সরস্বতীর মরাল যেন তার খাতার পাতায় আসিয়া ভর করিয়াছে! তার কলমের কালিতে স্রোত বহিতেছে···সেই স্রোতে মরাল ভাসিয়া চলিয়াছে···অবিরাম অভঙ্গ গতিতে!

লিখিতে লিখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। উঠিয়া সুইচ টিপিয়া বিজলী-বাতি জ্বালিয়া শেষের পাতাখানা পড়িয়া দেখিল। ছয়ের

পরিচ্ছেদ সুরু করিয়াছে। এ-পরিচ্ছেদে নায়ক প্রভাকর কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় পার হইতেছে…এবার আসিবে জাহ্নবীর সেই মোটর। নামটা?

রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন মনে পড়িল…

জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণা
পুণ্য-পীযুষ স্তন্য-বাহিনী!

ঠিক! নায়িকার নাম দিবে…যমুনা!

লেখা পাতাগুলির নম্বর দেখিল, ৪৫ সুরু হইবে। এক-টানে বসিয়া ৪৪ পাতা লিখিয়া ফেলিয়াছে! ৪৪ পাতায় ষোল-পেজী ছাপা বই প্রায় পাঁচ ফর্ম্মার উপর হইবে!

আদিত্য আবার লিখিতে লাগিল।

আহারাদি সারিয়া আবার লেখা…

শুইতে গেল ঘড়িতে একটা বাজিবার পর।

খাতায় পাতার নম্বর দেখিল ৮২। ৮২ পাতা শেষ করিয়াছে… যার নাম, ছাপার অক্ষরে প্রায় ন' ফর্ম্মা!

সকালে কঠিন কর্ত্তব্য।

চা খাইয়া আদিত্য গিয়া দেখা করিল ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে।

ম্যানেজার বলিল—ইয়েস্ স্যর, আপনার ঘর রেডি।

আদিত্য বলিল—তাহলে আমি গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসি।

—নিয়ে আসবেন বৈ কি…নিশ্চয়। খাওয়া-দাওয়া…?

আদিত্য বলিল—আজকের মতো আছে! তারপর দেখি, উনি কি বলেন!

ম্যানেজার বলিল—বেশ!

সতেরো

পাঁচ দিন পরের কথা···

রাজেশ্বরী হোটেলে আসিয়াছে। ছোট ঘরটিতে তার আশ্রয়। আদিত্য অনেক করিয়া বলিয়াছিল, না, বৌদি···আপনি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এ-ঘরে থাকুন।

রাজেশ্বরী শোনে নাই। জবাব দিয়াছিল—না, এ-ঘরে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা কায়ক্লেশে থাকবো, বলছেন! আপনি জানেন না, আমরা সেখানে যে-ঘরে থাকতুম, তাকে ঘর বলে না···বারান্দার কোণে কাপড়ের ছেঁড়া পর্দ্দা খাটিয়ে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকতুম!

নেপালী আয়া নাই। রাজেশ্বরী আসিয়াই তাকে বিদায় দিয়াছে। বলিয়াছে, তাহার এ-বোঝা আদিত্যর ঘাড়ে ফেলিয়াছে···তার উপর আবার একটা দাসী!···

ভবিষ্যৎ

সেদিন দুপুরবেলা আদিত্য বসিয়া লিখিতেছিল, 'ভবিষ্যৎ' উপন্যাস। বারো ফর্ম্মা লেখা শেষ হইয়া গিয়াছে···তেরোর ফর্ম্মা স্বরু হইতেছে···

লিখিতেছিল, বিদেশে আসিয়া বিধবা বৌদির সঙ্গে নায়ক প্রভাকরের অকস্মাৎ দেখা হইয়া গিয়াছে। চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে লইয়া এক ধনীর গৃহে জাঁতা পিষিয়া মুখের অন্ন সংগ্রহ করিতেছিল। উপন্যাসে সে যমুনার সঙ্গে নায়ক প্রভাকরের বিবাহ দিয়া বসিয়াছে। যমুনা এ-কালের পূরাদস্তর ফ্যাশনেব্‌ল্ মেয়ে···প্রভাকরকে সে করিয়াছে ডেপুটি। স্ত্রী যমুনা ধনী-বাপের কাছ হইতে মাসোহারা পায় পাঁচশো টাকা করিয়া; সে-টাকা তার বিলাস-ভূষণে ব্যয় হইয়া যায়। স্বামীর সে বড় তোয়াক্কা রাখে না...এমনি ধরণে প্লটকে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিয়াছে।

এখন লিখিতেছিল, চিরদুঃখিনী বৌদির সন্ধান পাইয়া তাঁর কষ্ট দেখিয়া তাঁকে ছেলেমেয়ে-সমেত নিজের বাসায় আনিয়া হাজির করিয়াছে। দেখিয়া স্ত্রী যমুনা রাগিয়া আগুন! ধমক দিয়া প্রভাকরকে বলিল—যত সব নোংরামি কাণ্ড! এত যদি দরদ, ওদের জন্য আলাদা বাসা ঠিক করো!

নায়ক প্রভাকর জবাব দিল—হুট্ বলতেই তো বাসা মেলে না! তার উপর এই বিদেশ···

যমুনা বলিল—আমি এখানে একদণ্ড থাকবো না···তুমি যদি ওদের এখানে রাখো।

এ-কথার পর যমুনা কালক্ষেপ করিল না। বাপের বাড়ীর চাকর ছিল শ্রীনিবাস···তাকে সঙ্গে করিয়া তখনি কলিকাতায় যাত্রা···নিজের পিতার কাছে।···

ছেলেমেয়ে দুটিকে ঘুম পাড়াইয়া রাজেশ্বরী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল ...নিঃশব্দে। লেখা বন্ধ করিয়া আদিত্য চাহিল রাজেশ্বরীর পানে; কহিল—কি খপর ?

রাজেশ্বরী বলিল—খবর কিছু নেই...

আদিত্য বলিল—ছেলেমেয়ে ঘুমোচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

রাজেশ্বরীর কণ্ঠ দীন...মুখ মলিন ! দুঃখ সহিয়া সহিয়া মুখে মলিনতার এমন ছোপ পড়িয়াছে যেন এ-জন্মে ও-মলিনতা মুছিবার নয় !

আদিত্য বলিল—বসুন বৌদি...

রাজেশ্বরী বলিল—না, থাক, আপনি কাজ করছেন...আপনাকে বিরক্ত করবো না।

আদিত্য বলিল—কাজ আর করবো না। আপনার সঙ্গে গল্প করি, আসুন। সত্যি...আপনি আমাকে কি না জানি ভাবেন ! দাম্ভিক, না, অসভ্য ! এসে পর্য্যন্ত দেখছেন, কাগজ আর কলম নিয়ে আছি .. মানুষ এলো, তার সঙ্গে দু'দণ্ড বসে দু'টো কথা কই না !...

বলিয়া সে চাহিল রাজেশ্বরীর দিকে। রাজেশ্বরীর মুখ মলিন...ম্লান। চোখের দৃষ্টি যেন উদাস...নির্লিপ্ত !

আদিত্য ব্যথা বোধ করিল...কণ্ঠকে সরস কোমল করিয়া বলিল—তাই নয়, বৌদি ?

রাজেশ্বরী বলিল—কি...নয় ?

কথাটা বলিল যেন কোন্ দূর-দূরান্তর হইতে !

আদিত্য বলিল—এই আমার ব্যবহার! বসে বসে খালি লিখছি ...কথা-বার্ত্তা কই না।

রাজেশ্বরী বলিল, আপনি কাজ করছেন!

—কাজই বৌদি, অকাজ নয়! এই লেখা লিখেই আমাকে পয়সা রোজগার করতে হয়।

রাজেশ্বরী বলিল—টেবিলে মাসিকপত্র আছে...তাতে আপনার লেখা ছাপা হয়েছে...না?

—হ্যাঁ...গল্প তো?

রাজেশ্বরী বলিল—আমি পড়েছি...আজ সকালে উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে।

—কেমন লাগলো?

—চমৎকার! পড়ার পাঠ বহুদিন উঠে গেছে...তাঁর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

আদিত্য বলিল—দাদা হঠাৎ চলে গেল কেন?

—কিছু বলেননি তো। দোকান ভালো চলছিল না। দেনা হয়েছিল। পাওনাদাররা নালিশ করলো। তাই একদিন হঠাৎ কাকেও কিছু না বলে...

কথা শেষ হইল না...নিশ্বাসের বাষ্পে!

আদিত্য বলিল—কাওয়ার্ড! দাদা চিরদিনই এমনি!...হেসে-খেলে থাকতে পারলো তো বেশ মানুষ! একটু বেগতিক দেখলো যদি তো কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই!...

—কিন্তু ও-কথা যাক...আমি শুধু ভাবি, এতদিন নিরুদ্দেশ...একটা খপর পর্য্যন্ত দেয় না! মায়া-দয়া একেবারে বিসর্জ্জন দিলে কি করে'?

রাজেশ্বরী কোনো জবাব দিল না···নত মুখে অপরাধীর মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

আদিত্য বলিল—বসুন বৌদি!

রাজেশ্বরী বলিল,—না, আপনি লিখুন···আমি শুয়ে একটু গড়াইগে।

আদিত্য বলিল—বিশ্রাম করতে চান, বাধা দেবো না। তবে লেখা আমি আপাততঃ বন্ধ রাখবো।···অনর্গল আর কত লিখি, বলুন?...একটু ভাবতে হবে তো!

রাজেশ্বরী বলিল—তাহলে···

আদিত্য বলিল,—এখন ভাববো না···ভাবতে পারছি না। আপনি বসুন, আপনার সঙ্গে গল্প করি।

রাজেশ্বরী বলিল—বসছি, কিন্তু আমার সঙ্গে কি-গল্পই বা করবেন! আমি মুখ্যু মানুষ···গল্পের কি-বা জানি!

আদিত্য বলিল,—আপনার নিজের গল্প বলুন···আপনার মায়ের কথা···বাবার কথা···

রাজেশ্বরী বসিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সে-সব আমার স্বপ্ন হয়ে গেছে···সে-সব কথা মনেও আনি না। মনে পড়লে মাথা যেন ঘুরে যায়! ভয় করে, যদি পাগল হয়ে যাই, ছেলেমেয়ে দুটোর কি গতি হবে তাহলে!

আদিত্য নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, রাজেশ্বরীর পানে...দুঃখে-মমতায় মন ভরিয়া উঠিল। বেচারী! এই বয়সে এত ব্যথা···এত বেদনা পাইয়াছে যে পুরানো দিনের একটু সুখের কথা মনে জাগিলে পাগল হইবার আশঙ্কা! রাজেশ্বরীর বুকের মধ্যে মন বলিয়া প্রাণ বলিয়া যে

বস্তু, তা' এখনো আছে! কালী হালদারের বাড়ীতে থাকিলেও কালী হালদারের মতো জানোয়ার নন্।...মনে পড়িল, রামায়ণের অহল্যার কথা! অহল্যা পাষাণ হইয়াছিলেন...সে-পাষাণ বোধ হয় এমনি! সত্যকারের পাথরের মূর্ত্তিতে তিনি রূপান্তরিত হন নাই...বাঁচিয়া ছিলেন... মনটা বেদনায় জমাট বাঁধিয়া পাথর হইয়া গিয়াছিল! পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের অনুভূতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ঠিক রাজেশ্বরীর মতো!

আদিত্য বলিল—আচ্ছা, আপনার গল্প পরে শুনবো। তার আগে আমার গল্প বলি, আপনি শুনুন। আমিও একদিন এমন দুঃখী গরীব ছিলুম না, বৌদি! বাবার ছিল মস্ত বড় কাঠের কারবার—তাতে বহু লোক খাটতো...কাজ করতো। আমাদের অনেক টাকা-কড়ি ছিল! ছেলেবেলাটা কি আনন্দে কেটেছে...কতখানি আরামে। আমার নিজের জন্য ছিল একটা চাকর...সে শুধু আমার সেবা করতো। বাবা আমাকে একটা ঘোড়া কিনে দিয়েছিলেন...চমৎকার সাদা পনি-ঘোড়া। আমি শীকারে যেতুম। অভাব কাকে বলে, তা যেমন কখনো জানিনি, তেমনি পয়সাতেও আমার কোনো দিন এতটুকু মমতা বা লালসা ছিল না বৌদি!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আদিত্য চুপ করিল। কথাগুলা নিজের কাণেই কেমন অদ্ভুত লাগিতেছিল! টাকা-পয়সায় তার কোনো মায়া ছিল না! এতটুকু লালসা নয়! আর আজ একটা টাকার জন্য...

মানুষ কি-অহঙ্কারে যে নিজের ভাগ্য রচনা করিতে বসে! এ-কাজ করিব...ও-কাজ করিব...এমন হইব...এ-কথা শুনিয়া ভাগ্য অন্তরালে বসিয়া হাসে! তাচ্ছল্য-ভরে বলে, মূঢ় মানুষ!

ভবিষ্যৎ

পিয়ন আসিল। বলিল,—একটা ইন্সিয়োর আছে।

বুকখানা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। যে-টাকায় লালসা নাই, সেই টাকা!

সুধীর বাবুকে ধন্যবাদ! চিঠি পাইবামাত্র বিশ্বাস করিয়া টাকা পাঠাইয়াছেন! আঃ!

সই করিয়া ইন্সিয়োর-খাম লইল। কভারের মধ্যে দুশো টাকা। সুধীর চিঠি লিখিয়াছে—

আপনার সর্ত্তে রাজী। কপিরাইটের জন্য হাজার টাকা দিব। তার তিনশো পাঠাইলাম, আর বাকী সাতশো কাপি পাইবামাত্র দিব। উপন্যাসের নামটা জানাইবেন। তাহা হইলে এখন হইতেই বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা করিব!

ধন্যবাদ! শত-সহস্র ধন্যবাদ!

আরো দু'খানা চিঠি আসিয়াছে। একখানা লিখিয়াছে উমেশ; আর একখানা এক নূতন পাবলিশার ক্ষিতীশ ভটচায্যি।

ক্ষিতীশ ভটচায্যি লিখিয়াছে, সে খুলিয়াছে নূতন পাবলিশিং কোম্পানি। সে চায় আদিত্যর ক'টা ছোট গল্পের সংগ্রহ ছাপিয়া বই বাহির করিতে। একটা সংস্করণ··· এগারোশ' কাপি তার জন্য আদিত্য কত টাকা চায়, দয়া করিয়া যদি তার একটু আভাস···

আদিত্য বলিল মনে-মনে—দয়া! দয়া! দয়া! অতি সজ্জন সাধু তুমি ক্ষিতীশ পাবলিশার!

উমেশের চিঠি খুলিল। উমেশ লিখিয়াছে···

ভবিষ্যৎ

প্রিয় আদিত্য

তোমার চিঠি পড়িয়া আশ্চর্য্য হইলাম। উপন্যাসেও যে এমন ঘটে না! যাই হোক, বিপন্ন বৌদিকে দেখা তোমার কর্ত্তব্য। সে-কর্ত্তব্যে তুমি সচেতন দেখিয়া বড় খুশী হইলাম।

তুমি যাহা লিখিয়াছ, বেশ, তাই করিয়ো।

এখানে তোমার বৌদিকে আনিয়া দশ-বারো দিন রাখিতে পারো। অসুবিধা হইবে না। তার বেশী রাখা সঙ্গত নয়। রাখিলে তাঁর কষ্টের একশেষ হইবে।

আলাদা বাসার কথা লিখিয়াছ। আমার গৃহিণী তো আমাকে অস্থির করিয়াছেন। তিনি আর আমাকে ছাড়িয়া আলাদা থাকিতে পারিবেন না। লিখিয়াছেন, সঙ্গে যদি রাখিব না তো বিবাহ করিলাম কেন? তাঁর কি সংসারে সাধ হয় না? এমন করিয়া সারাজীবন কাটাইব! বলেন, এখানে মেসে নাকি আমার খুব কষ্ট হয়। বলেন, মানুষ বিবাহ করে স্ত্রী-পুত্রের সেবা পাইতে, তাদের সঙ্গে বাস করিয়া আরাম পাইতে। নহিলে মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ কোথায়! লিখিয়াছেন, কাহারো বাড়ীর একতলায় দু'খানা ঘর যেন ভাড়া করি...ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করিয়া তিনি আসিয়া আমার সঙ্গে থাকিবেন।

ইতিমধ্যে তোমার চিঠি পাইয়া যা বুঝিলাম, তোমারো একটি বাসা চাই। তাই ভাবিতেছি, এই গলিতেই একখানি বাড়ী আছে...বাড়ীর মালিক ভূষণ বাবু ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধ। চাকরিতে পেন্সন লইয়াছেন। সংসারে একটি বিধবা মেয়ে আছে। মেয়ের দুটি ছেলে। ছেলে দুটিকে মানুষ করিবার ভার তাঁর। তাঁরি বাড়ীর নীচের তলায় চারখানি ঘর আছে। নীচের তলার জন্য তিনি ভাড়া চান ত্রিশ টাকা। তুমি আমি মিলিয়া দুজনে যদি নীচের তলা ভাড়া লই—কি বলো? পনেরো টাকা করিয়া পড়িবে... তুমি দুখানা ঘর লইবে...আমি দুখানা লইব। রান্নাঘরের ব্যবস্থা পরামর্শে স্থির হইবে। যদি মত থাকে, লিখিয়ো। তাহা হইলে বায়না স্বরূপ কিছু দিয়া আমি ব্যবস্থা করিয়া ফেলি। বাড়ীর যে রকম ডীমাণ্ড, পড়িয়া থাকিবে না। এ বিষয়ে শীঘ্র লিখিয়া মতামত জানাইবে।

ইতি তোমার

উমেশদা

চিঠি পড়িয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে আদিত্য ডাকিল—বৌদি···

রাজেশ্বরী আপন-মনে কি ভাবিতেছিল···সে-স্বরে চমকিয়া আদিত্যর পানে চাহিল।

আদিত্য বলিল—আপনি আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, বৌদি। জানেন, কি সব চিঠি এলো?

আদিত্য সব কথা রাজেশ্বরীকে খুলিয়া বলিল।

বলিল, বই লিখিয়া তার দিন চলে। বৌদির ভার ঘাড়ে লইয়া টাকার ব্যবস্থা-কল্পে সে দু' তিন জায়গায় চিঠি লিখিয়াছিল···এক জায়গা হইতে চাহিবামাত্র তার নামে আসিয়াছে এই তিনশো টাকা··· একখানা বই লিখিয়া দিতে হইবে···সেজন্য এরা আগাম পাঠাইয়াছে তিনশো। বই শেষ করিয়া দিলে আরো সাতশো দিবে...মোট মিলিবে এক হাজার।

তারপর সে চিঠি লিখিয়াছিল কলিকাতার মেসে। বৌদিকে লইয়া মেসে থাকা চলিবে না···তাই ছোট বাসার ব্যবস্থা করিতে লিখিয়াছিল মেসের উমেশদার কাছে। উমেশদা তার উত্তরে লিখিয়াছেন এই···

উমেশের চিঠি রাজেশ্বরীকে আগাগোড়া সে পড়িয়া শুনাইল।

নিঃশব্দে বসিয়া রাজেশ্বরী চিঠি শুনিল। চিঠির প্রত্যেকটি কথা মনের উপর যেন বসন্ত-বাতাসের স্পর্শ বুলাইয়া চলিয়াছে।···

চিঠি শেষ করিয়া আদিত্য চাহিল রাজেশ্বরীর দিকে···রাজেশ্বরীর দু'চোখে অশ্রু।

আদিত্য ভাবিল, এই অশ্রুকেই কবিরা বলেন, আনন্দাশ্রু!

আদিত্য বলিল—কাঁদছেন বৌদি?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দু'চোখের জল মুছিয়া রাজেশ্বরী বলিল—না।

আদিত্য বলিল—ছেলে মেয়ে দুটো কষ্ট পাবে না বৌদি…সে-সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে আপনার কষ্ট ! দেখি, দাদার উদ্দেশ যে করে হোক, পেতেই হবে।

অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে রাজেশ্বরী বলিল—সেজন্য আমি কাতর নই ঠাকুরপো।. সে-আশা জীবনে আর করি না। শুধু এই ছেলেমেয়ে দুটো… বলেছি তো, এ দুটোর মুখের পানে চেয়েই আমাকে বাঁচতে হবে। মৃত্যু এসে যদি হাত ধরে ডাকে, তাঁর পায়ে ধরে তাঁকে মিনতি জানিয়ে বলবো…এ-দুটোকে আগে ডাগর করি ঠাকুর…নিজের পায়ে ভর করে ওদের দাঁড়াতে দাও, তারপর আমাকে ডেকো…তখন আর আমি একদণ্ড থাকতে চাইবো না।

রাজেশ্বরীর দু'চোখে দরবিগলিত ধারা।

আদিত্য নির্ব্বাক...নিস্পন্দ। সে-ধারা তার বুকের মধ্যে বেদনার উৎস খুলিয়া দিল।

আঠারো

কলিকাতা…

বাবুর বাড়ীর একতলায় চারখানি ঘর লইয়াছে আদিত্য আর উমেশ। দেশের বাড়ী হইতে উমেশ তার দ্বিতীয়-পক্ষ মনোরমাকে আনিয়াছে…আরপক্ষের ছেলে-দুটি আসে নাই, সেখানকার স্কুলে পড়াশুনা করিতেছে। নূতন ক্লাশে প্রোমোশন পাইয়াছে—রেজাল্ট ভালোই করিতেছে…হুট্ করিয়া স্কুল বদলানো! হেড-মাষ্টার বলিলেন—এইখানেই থাকুক। আমরা দেখবো-শুনবো। কলকাতার স্কুলে পাঁচশো ছেলের মধ্যে গেলে হরিবোল দিয়ে বেড়াবে। তাছাড়া বাড়ীতে আছে উমেশের দুই ভাই রমেশ আর পরেশ…তারা বলিল—ছেলেরা এইখানে থাকুক, দাদা।

রান্নার ব্যবস্থা আলাদা। রাজেশ্বরীর সঙ্গে মনোরমার বেশ বনিবনা হইয়াছে। রাজেশ্বরী এত-বড় ঔপন্যাসিকের বৌদি…আর মনোরমা তো গল্প-উপন্যাসের পোকা!

আদিত্যর বড় উপন্যাসখানা এখনো শেষ হয় নাই। বাইশ পরিচ্ছেদের পর: কেমন. গোল বাধিয়া গিয়াছে। আদিত্যর মাথা যেন ঝামা হইয়া আছে! কল্পনা আসিয়া মাথায় দাঁড়াইতে পারে না…সে ঝামায় তার পা যেন ছড়িয়া যায়! আদিত্য ভারী বিপদে পড়িয়াছে।

জগদীশ পাবলিশারকে কটা গল্প গছাইয়া দেড়শো টাকা আদায় করিয়াছে। কিন্তু মেশের পুরানো দেনা…এখানে বৌদির সংসার গুছাইয়া দেওয়া…এ-সবে তার হাত প্রায় খালি! উপায়?

বাড়ীওয়ালা ভুবনবাবু লোকটি ভালো। তাঁর জানা সদানন্দ বাবু… রিটায়ার্ড সাব-জাজ,…এক-পাল ছেলেমেয়ে।…শেষের পাঁচটি ছেলের জন্য তিনি টিউটর খুঁজিতেছিলেন। দিন যা পড়িয়াছে, ছাত্রের মাথা পিছু বি-এ, এম-এ টিউটররা চায় ত্রিশটা করিয়া টাকা! ভুবনবাবুর কাছে তাই তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, এখন কি আর সে মাইনে আছে যে…হুঁঃ, পেন্‌শনে কটা টাকাই বা পাই? এর মধ্যে বুঝলেন কি না…

ভুবনবাবু সেদিন সান্ধ্য-ভ্রমণ সারিয়া গৃহে ফিরিয়া ডাকিলেন—আদিত্য বাবু…

আদিত্য বসিয়া ছেলেদের জন্য এক রোমাঞ্চকর উপন্যাস লিখিতেছিল। পাবলিশার বলিয়াছে. কপি-রাইটের জন্য দাম দিবে

নগদ একশো টাকা…একশো পাতার বই সে চায়। এ-বইয়ের নাকি এখন ভারী পশার! একমাসে হাজার কপির একটা করিয়া এডিশন্ সাবাড় হইয়া যায়!

ভুবনবাবুর আহ্বানে আদিত্য আসিল বাহিরে, বলিল,—ডাকছেন?

—হ্যাঁ। টুইশনি করবেন?

—কেন করবো না? পয়সা চাই…যেন-তেন প্রকারেণ। কজনকে পড়াতে হবে?

—পাঁচটিকে। তবে সব-কটিই ম্যাট্রিকের গণ্ডীর মধ্যে আছে।

—বটে।…পাঁচটির জন্য দক্ষিণা দেবে কত?

ভুবনবাবু বলিলেন—লোকটা ভারী কঞ্জুষ!…জজীয়তী করে পেন্সন ভোগ করছে…টাকা হলো জপের মন্ত্র; বেশী দেবে বলে মনে হয় না। তবে বলে-কয়ে দেখবো, যদি টাকা তিরিশের করা যায়?

আদিত্য বলিল—দেখুন আপনি বলে-কয়ে! বাঁধা আয়…মন্দ কি!

ভুবন বাবু বলিলেন,—আমিও বলি, মন্দ নয়! লেখাটা তাহলে স্থির হয়ে ভেবে-চিন্তে লিখতে পারবেন।…লেখার উপরেই যদি সমস্ত নির্ভর রাখেন, তাহলে মন স্থির করে লেখা অনেক সময় ঘটে ওঠে না! একটা বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাছাড়া মানুষের মাথা তো! তার খাটবার একটা সীমা আছে! সত্যি এ মেশিন নয়! মাথাকে মাঝে-মাঝে রেষ্ট দিতে হয়…পুঁজি সংগ্রহ করতে।

মৃদু হাস্যে আদিত্য বলিল,—যা বলেছেন!

সেই ব্যবস্থাই হইল। ভুবনবাবু বলিয়া-কহিয়া সদানন্দ সাব-জাজকে

তিরিশে রাজী করাইলেন। আদিত্য পঞ্চ-পাণ্ডবের টিউটরের পদ গ্রহণ করিল।

রাত্রে রাজেশ্বরী বলিল—এর ওপর আবার মাষ্টারী নিলেন ঠাকুরপো?

আদিত্য বলিল—উপায় কি, বৌদি?

রাজেশ্বরী বলিল,—না...না! আমার জন্য এত পরিশ্রম! শরীর থাকবে কেন? এ কী আপদ এসে আমি ঘাড়ে ভর করলুম, বলুন তো! আপনি লেখক মানুষ...আপনার লেখার কত দাম! আপনি শেষে মাষ্টারী করবেন! যাকে বলে, গরু তাড়ানো!

আদিত্য বলিল,—না, না, বৌদি, কি বলছেন আপনি! খুব ভালো কাজ। বিদ্যা-দান!

রাজেশ্বরী বলিল—না! এ আমার একেবারে ভালো লাগছে না!

আদিত্য বলিল—একটা বাঁধা আয় হলো। বাজার-খরচের সম্বন্ধে তো আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। বাজার-খরচের জন্য আমাকে যদি খোঁচা না দেন, আমিও তা হলে নিরাপদে লেখার মশলা সংগ্রহ করতে পারবো।...তাছাড়া মাষ্টারী যে করবো, সে তো সন্ধ্যাবেলায়...দু' ঘণ্টা মাত্র।

রাজেশ্বরী জবাব দিল না; গম্ভীর নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

মনোরমা ঢুকিল ঘরে। বলিল—আসতে পারি?

আদিত্য বলিল—স্বচ্ছন্দে।

মনোরমার হাতে একখানা মাসিক-পত্র। মনোরমা বলিল—এ কাগজে এই যে উপন্যাসটা বেরুচ্ছে, এর গোড়াটুকু আমাকে আনিয়ে দিতে হবে ঠাকুরপো।

আদিত্য বলিল—কি কাগজ ?

—এই যে···"দীপ্তি" ।

—ও···আচ্ছা, দেখবো। ওরা আমার লেখার প্রত্যাশায় মাঝে মাঝে আসে তো। বলবো, দীপ্তির আগের নম্বরগুলো দিয়ে যেতে।

—বলবেন, লক্ষ্মীটি!

তারপর মনোরমা চাহিল রাজেশ্বরীর দিকে, বলিল—দিদির এমন

হাসিয়া আদিত্য বলিল—সংসারে যাঁরা গৃহিণী, তাঁদের প্রসন্ন মুখ জীবনে কে কবে দেখেছে, বলুন ? প্রসন্ন মুখে গৃহিণীর গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়!

হাসিয়া মনোরমা বলিল—বটে ? আমাকেও তো গিন্নীপনা করতে হয়! আমাকে কখনো গম্ভীর দেখেছেন ?

আদিত্য বলিল,—আপনার সঙ্গে আর কারো তুলনা চলে না। আপনি হলেন দাদার শিরোমণি!

—থাক্ থাক্···যা বলবেন, বুঝেছি! সত্যি, আপনারা যে তামাসা করেন দ্বিতীয়-পক্ষ, দ্বিতীয়-পক্ষ বলে'···আমার তো একটি দিনের জন্ম মনে হয় না যে উনি আমাকে দ্বিতীয়-পক্ষে বিয়ে করে এনেছেন! প্রথম-পক্ষের সঙ্গে আমার কোন্খানে প্রভেদ দেখছেন, বলুন তো ?

হাসিয়া আদিত্য বলিল—বলে শেষে শ্রীঘর-বাসের ব্যবস্থা করি আর কি!

তারপর মনোরমার হঠাৎ চোখ পড়িল দেওয়ালে-ঝুলানো বাঙ্লা ক্যালেণ্ডারে। বলিল—আজ বাংলা মাসের কত তারিখ হলো ঠাকুরপো ?

আদিত্য বলিল—৮ই বৈশাখ।

—সত্যি! তাহলে...

বলিয়া মনোরমা আগাইয়া গেল সেই ঝুলানো ক্যালেণ্ডারের দিকে, নিবিষ্ট-মনে তারিখ দেখিতে লাগিল।

আদিত্য ফিরিয়া তাকাইল, বলিল—কিসের তারিখ দেখা হচ্ছে?

মনোরমা বলিল—১৫ তারিখ। সেটা কি বার হবে?

আদিত্য বলিল—আজ হচ্ছে সোমবার...সেদিন হবে রবিবার। কিন্তু কেন বলুন তো, এত তারিখ থাকতে ১৫ তারিখটির উপর এত মমতা?

মনোরমার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল! লজ্জা-পুলক-মিশ্রিত কণ্ঠে মনোরমা বলিল—আমাদের বিয়ের তারিখ হলো ১৫ই।

আদিত্য বলিল—ও...তা...সেদিন তাহলে ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা হচ্ছে! সত্যি বৌদি, খাওয়াতে হবে। আসল ১৫-তারিখটিতে যখন ফাঁকি পড়েছি, তখন তার পুনরুদয়ে যেন সে-ফাঁকির খেশারৎ আদায় হয়!

লজ্জানম্র মুখে মনোরমা বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা...সে তখন দেখা যাবে। সে এ-কথা বলিয়া সে আর দাঁড়াইল না...বিদ্যুতের গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আদিত্য ভাবিল, ১৫ই বৈশাখ...বিবাহের তারিখ! তার আগে ঐ ১৩ তারিখে আদিত্যর বিবাহ হইবার কথা ছিল! পাকা কথা! শ্রীমতী জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে বিবাহ! আজ...বৈশাখ মাসের ৮ তারিখ! আর পাঁচ দিন পরে সেই ১৩ তারিখ!

রাজেশ্বরী ডাকিল—ঠাকুরপো…

—বলুন…আদিত্য চাহিল রাজেশ্বরীর দিকে।

রাজেশ্বরী বলিল—এ-চাকরি আপনি ছেড়ে দিন।…গল্প-উপন্যাস যা লিখতে পারবেন, তাতেই আমি চালিয়ে নেবো…কষ্ট হবে না।

—না বৌদি, মাপ করবেন। তা হতে পারে না।…দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলতে আর বাসন মাজতে যদি আপনার কষ্ট না হয়…আমারো গল্প-উপন্যাস লিখে সন্ধ্যার সময় মাষ্টারী করতে কোনো কষ্ট হবে না। ডিবিজন্ অফ লেবর…বুঝলেন! এ না হলে সংসার সংসার থাকেনা!… আমাকে আপনি এ-অনুরোধ আর করবেন না। করলে আপনার মান আমি রাখবো না…রাখতে পারবো না। আমাকে আপনি ভালো রকম না জানলেও…অর্থাৎ আমার নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয়…আমার পূজনীয় দাদাকে তো ভালো করেই জেনেছেন…তাই থেকে বুঝে নেবেন, আমি সেই দাদার ভাই। আমরা ভারী গোঁয়ার-গোবিন্দ! কারো মুখের পানে কোনো দিন চাইতে শিখিনি…অপরের মনে যদি ব্যথা লাগে তো সে-ব্যথা অবহেলা করে নিজেদের সঙ্কল্প সাধন করি!

—আশ্চর্য্য মানুষ আপনি! বলিয়া নিরুপায়ের নিশ্বাস ফেলিয়া রাজেশ্বরী ধীর-পায়ে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

রাজেশ্বরী চলিয়া গেলে ক্যালেণ্ডারে-ছাপা ১৩ তারিখটি মনের পটে জলজল্ করিয়া ভাসিয়া উঠিল।…

বৈশাখ মাসের ঐ ১৩ তারিখ!…

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, জাহ্নবী!

জাহ্নবীর বিবাহ আদিত্যর সঙ্গে ভাঙ্গিয়া গেলেও ঐ ১৩-তারিখেই

ঠিক আছে তো? এবারে কার সঙ্গে বিবাহ?…নিশ্চয় সেই মুকুল ব্যারিষ্টারের সঙ্গে!

উপন্যাসের পরিচ্ছেদ লিখিবে, ভাবিয়াছিল! লেখার জন্য খাতা লইয়া বসিতে পারিল না! মন বলিল, আশ্চর্য্য মানুষই বটে! মনে একটু কৌতুহল জাগে না? জাহ্নবীর কি হইল…সে-সম্বন্ধে কৌতুহল? প্রেম নয়, ক্ষোভ নয়…শুধু একটু কৌতুহল! কৌতুক-মিশ্রিত কৌতুহল!

আনলা হইতে পাঞ্জাবিটা টানিয়া গায়ে চড়াইল এবং তখনি বাহির হইবার উদ্যোগ করিল।

সামনেব দালানে বসিয়া রাজেশ্বরী ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইতেছিল, আদিত্যকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া প্রশ্ন করিল,—কোথায় বেরুনো হচ্ছে, শুনি?

আদিত্য বলিল—এখনি আসছি। একটা দরকারী কাজ ভুলে গিয়েছিলুম। তাই…

রাজেশ্বরী বলিল—কিন্তু রান্না হয়ে গেছে…খেয়েদেয়ে বেরুলে হতো না? ভাতগুলো ঠাণ্ডা কড়্কড়ে হয়ে যাবে যে!

আদিত্য বলিল—দেরী হবে না বৌদি…আমি এখনি ফিরবো।

আদিত্য বাহির হইয়া গেল।

ট্রামে চড়িয়া গেল সোজা একেবারে চিন্তাহরণের গৃহের উদ্দেশে চিন্তাহরণের বাড়ী বকুলবাগানে।

দূর হইতে দেখিল, বাড়ীর মাথায় হোগলার চালা ওঠে নাই···ফটকে নহবৎখানা তৈয়ারীর কোনো ব্যবস্থা নাই !

এক-পা এক-পা করিয়া চোরের মতো অগ্রসর হইল···আসিল একেবারে বাড়ীর সামনে। আকাশে চাঁদ ছিল না...অন্ধকারের আব্-ছায়া···সেই অন্ধকারে গা ঢাকিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

বাড়ীর ঠিক সামনে ! গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল ! যদি কেহ দেখিয়া ফেলে ?

উপরের ঘরে একটা অট্টহাসি···চিন্তাহরণের হাসি ! ও-হাসিতে পৃথিবী যেন ফাটিয়া চূর্ণ হইবে ! বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। আদিত্য ভাবিল, হয়তো তারি কথা লইয়া হাসি-তামাসা চলিয়াছে ! হয়তো তামাসা চলিতেছে···ভাগ্যে বেকুব আদিত্য মানে-মানে সরিয়া গিয়াছে, নহিলে তাহারি অভ্যর্থনার জন্য আজ কি বিরাট আয়োজনই না করিতে হইত !

কিম্বা হয়তো আদিত্যের কথা এ-বাড়ীতে আর হয় না ! তাকে সকলে ভুলিয়া গিয়াছে···চিন্তাহরণ নিশ্চয় আদিত্যকে ভুলিয়াছে ! কিন্তু গিরিবালা ? কেনই বা তিনি আদিত্যর কথা মনে করিবেন ? তাকে যেটুকু আদর-যত্ন করিতেন, সে শুধু জাহ্নবীর মুখ চাহিয়া ! জাহ্নবীর সঙ্গে যদি বিবাহ হয়, তাই। নহিলে আদিত্য তাঁর কে ?···আর জাহ্নবী ?

সমস্যার ঘূর্ণীতে মন ঘুরপাক্ খাইতে লাগিল ! কি-অনায়াসে কত রকমের নারী-চরিত্র লইয়া আদিত্য কত রকমের ছবি লেখে··· আসলে নারী-চরিত্র কি বস্তু, তার কি-বা সে জানে ! ভুল ধারণার

বশে হয়তো যা-তা লেখে! পড়িয়া মেয়েরা হয়তো হাসে!...রাজেশ্বরীর কথা মনে পড়িল। উপন্যাসে এই রাজেশ্বরীর কথা লিখিলে, হয়তো লিখিত স্বামীর ধ্যানে তন্ময়...বিচ্ছেদ-বেদনায় অবিচারের লজ্জায় রাজেশ্বরীর ভিতরটা পাথর হইয়া গেছে! কিন্তু রাজেশ্বরী সেদিন বেশ সুস্পষ্ট ভাষায় আদিত্যকে বলিয়াছে, স্বামীর কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে...স্বামীর সম্বন্ধে মনে সে এতটুকু আশা রাখে না!...বলিয়াছে, রাজেশ্বরী বাঁচিয়া আছে শুধু এই ছেলেমেয়েগুলার জন্য...ছেলেমেয়েদের লইয়াই তার সব...ছেলেমেয়েদের সুখ ছাড়া জগতে আজ সে আর কিছু চায় না!...তবে...

এমনি চিন্তায় আদিত্য তন্ময়...হঠাৎ একটি পরিচিত কণ্ঠ...জাহ্নবীর কণ্ঠ!

আদিত্য চমকিয়া উঠিল...তার ধ্যান ভাঙ্গিল।

বেশ উচ্চ রবে জাহ্নবী বলিতেছিল—না, না...ফটক পর্য্যন্ত যাবো...মুকুল বাবুকে এগিয়ে দিতে।

এখনো মুকুল!

ফটকের সামনে হইতে সরিয়া একটু দূরে গিয়া আদিত্য দাঁড়াইল...দৃষ্টি ফটকে সংবদ্ধ। ভাবিয়াছিল, কি হইবে ওদিকে চাহিয়া? তবু চোখের দৃষ্টি সে-নিষেধ মানিল না!

দেখিল, ফটক ছাড়িয়া মুকুল পথে বাহির হইল ...বিলাতী পোষাক-পরা...মুকুলের পিছনে জাহ্নবী। তারপর ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া দুজনে কথা!...

কি কথা? কি?...নিশ্চয় মনের অতি গূঢ় কথা...দোতলায় মা—

বাপের সামনে যে-কথা বলে নাই,···বলিতে পারে নাই···হৃদয়ের গহনে সঞ্চিত সেই সব কথা! আদিত্যর বুকের মধ্যে কে যেন সজোরে মুগুর মারিতে লাগিল!

হাসিয়া মুকুল সিগারেটের ছাই ঝাড়িল···তারপর দুজনে হাতে-হাতে ধরিয়া বিদায়-বাণী···

—গুড্ নাইট্!

—গুড্ নাইট্!

মুকুল চলিয়া গেল···ওদিকে। আদিত্য দাঁড়াইয়া ছিল ফটকের এদিকে···জাহ্নবী দাঁড়াইয়া রহিল ফটকের সামনে···নিস্পন্দ মূর্ত্তি!

আদিত্য সংখ্যা গণিতে লাগিল···এক···দুই···তিন···চার···পাঁচ···ছয়...সাত···

বাহান্ন গণনার পর জাহ্নবী ফটকের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিল।···

নিশ্বাস ফেলিয়া আদিত্য আসিল আবার সেই ফটকের সামনে। ফটকের দিকে চাহিল।

জাহ্নবী নাই···ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। পাশে কোথায় কোন্ কোণে বসিয়া একটা ভৃত্য রামায়ণ পড়িতেছিল···

মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী!

উনিশ

রাত্রে ভালো ঘুম হইল না। ঘুমে চোখ বুজিয়া আসে, হঠাৎ মনে হয়, মুকুল আসিয়া ডাকিতেছে·· তার হাতে নিমন্ত্রণের কার্ড···জাহ্নবীর সঙ্গে মুকুলের বিবাহ।···চমকিয়া চোখ চাহিয়া দেখে, কোথায় কে!

কখনো স্বপ্নের ঘোরে দেখে, সামনে দাঁড়াইয়া চিন্তাহরণ···চোখে তাঁর রোষের অগ্নিশিখা···কণ্ঠে সেই বজ্রনির্ঘোষ! তাকে উদ্দেশ করিয়া চিন্তাহরণ হাঁকিয়া বলেন—যাও···খবর্দ্দার···আর আমার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবে না···ইউ স্কাউণ্ড্রেল!

সকালে উঠিয়া স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিল। মনে হইতেছিল, জাহ্নবীর সঙ্গে তার বিবাহ না হোক, তাই বলিয়া আদিত্যর সম্বন্ধে এত-বড় কদর্য্য ধারণা তাঁহারা মনে পোষণ করিবেন···আর জানিয়া-শুনিয়া আদিত্য তাহা সহিয়া থাকিবে···কেন? গিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, আদিত্য স্কাউণ্ড্রেল নয়···সে মানুষ···মানুষের মতো মানুষ!

মন তার নোব্‌ল্‌…মনের দিক দিয়া চিন্তাহরণের চেয়ে আদিত্য অনেক-বড়! চিন্তাহরণ তো লক্ষ-লক্ষ টাকার গদিতে বসিয়া আছে…হঠাৎ যদি কোনো দুর্ভাগিনী নারী আসিয়া চিন্তাহরণকে বলে, সে তার আত্মীয়া…নিঃসম্বল…নিঃসহায়…নিরাশ্রয়…তাকে আশ্রয় দিতে হইবে, তাহা হইলে চিন্তাহরণ আর যাই করুক্‌ না কেন, সে-নারীকে কদাচ আশ্রয় দিবে না! আর আদিত্য? নিজে নিঃসহায়…নিঃস্ব - নিঃসম্বল হইলেও খুশী-মনে এ-ভার মাথায় লইয়াছে…কর্ত্তব্য বুঝিয়া!

…কিন্তু কিসের কর্ত্তব্য?…যে-ভাই কখনো তার মুখের পানে চাহে নাই…পিতৃধনে তাকে বঞ্চিত করিয়াছে…মিথ্যা কথায় ফাঁকি দিয়াছে… তারপর এত-বড় শয়তানী করিতে গিয়া নিজের নামটাও গোপন করিয়া আদিত্যর নাম চুরি করিতে ছাড়ে নাই…মনে সুগভীর অভিসন্ধি না থাকিলে মানুষ নিজের নাম বদলায় না! সেই ভাইয়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার কি প্রয়োজন ছিল আদিত্যর?

মনে হইল, ওই মানুষ আবার বিদ্যা-বুদ্ধির গর্ব্ব করে! লোকের মুখে যা-তা কথা শুনিয়া এমনিভাবে যে দিক্‌বিদিকের জ্ঞান হারায়, তার সঙ্গে বাস করার চেয়ে বনে বাস করাতেও আরাম আছে!

…কিন্তু চিন্তাহরণ যাই করুক…জাহ্নবী?

আদিত্যর সঙ্গে অমন করিয়া মিশিয়াও জাহ্নবী তাকে চিনিতে পারে নাই?…এই নারী! এই নারীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিয়া, এই নারীর স্তুতি গাহিয়া আদিত্য নভেলের পর নভেলের পাতা ভরাইতেছে!

রাজেশ্বরী আসিল, বলিল—কাল রাত থেকে ছেলেটার খুব জ্বর হয়েছে, ভাই!

আদিত্যর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। আদিত্য বলিল,—

—হ্যাঁ। গা পুড়ে যাচ্ছে! সারা রাত দুটি চোখের পাতা এক করে নি! ··তেষ্টায় কেবলি জল-জল করে চেঁচিয়েছে!

—বটে!...আমাকে ডাকেননি কেন?

—পাগল হইনি তো! সারাদিন কি পরিশ্রম না করেন! তারপর রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুম···সে-ঘুমেও বাদ সাধবো!

আদিত্য অবিচল দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল রাজেশ্বরীর পানে ···রাজেশ্বরীর দুই চোখে দীন করুণ দৃষ্টি...যেন কত অপরাধ করিয়াছে!···

বলিল—একটা শিক্ষা হলো আমার, বৌদি···

—শিক্ষা! রাজেশ্বরীর কণ্ঠে অনেকখানি বিস্ময়!

আদিত্য বলিল—শিক্ষা নয়? রাত্রে আমারো যদি কোনোদিন বেশী অসুখ করে,...পড়ে-পড়ে যাতনা সহ্য করবো, তবু আপনাকে ডাকবো না! সারাদিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে রাত্রে একটু ঘুমোবেন, তাতেও বাদ সাধবো!

ছেলের জ্বরের জন্য মনে অনেকখানি উদ্বেগ···তবু আদিত্যর এ-কথায় রাজেশ্বরী না হাসিয়া থাকিতে পারিল না! হাসিয়া রাজেশ্বরী বলিল—লেখক-মানুষ কি না···তাই সব-তাতেই সাহিত্য করা চাই!

আদিত্য বলিল—কিন্তু না, সাহিত্য নয়, রঙ্গ-রহস্যও নয়। গলির মোড়ে আছেন বিমল বাবু ডাক্তার···তাঁকে গিয়ে বলি···তিনি এসে দেখে যান!

কথাটা শেষ করিয়াই আদিত্য উঠিল···উঠিয়া আন্‌লার কাছে গেল পাঞ্জাবি লইতে।

রাজেশ্বরী বলিল—আনবার কি দরকার ভাই? এলেই তো দু' টাকা ভিজিট নেবেন। তার চেয়ে···খেন্তির মা এসেছে···বাসন মাজচে ···সে বরং কোলে করে নিয়ে যাক্ আপনার সঙ্গে···দেখিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করুন।

আদিত্য বলিল—গরীব আমি, সত্যি...তা বলে' আমাকে এমন নরাধম ভাবেন যে ভাইপোটাকে তার এই জ্বর-শুদ্ধ টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাবো...দুটো টাকা বাঁচাবার জন্য!...ছি বৌদি, আমাকে এমন পয়সা-পিশাচ ভাবেন আপনি!

রাজেশ্বরী একেবারে এতটুকু হইয়া গেল! সলজ্জ ভঙ্গীতে বলিল—সত্যি ঠাকুরপো, তা মনে করে আমি ও-কথা বলিনি,—সত্যি, তা নয়! এখন একটু ভালো আছে মনে হচ্ছে···কথাবার্ত্তা কইছে, তাই খামোকা দু' দুটো টাকা খরচ হবে,···যদি দশদিন ভোগে···এই ভেবেই বলেছি!

আদিত্য বলিল—যদি দশদিন ভোগে, তাহলে দশ দিনই ডাক্তারকে ডেকে এনে দেখাতে হবে।···খরচের ভয়ে বিনা-চিকিৎসায় ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে মানুষকে ফেলে রাখা চলে না!

রাজেশ্বরী আরো লজ্জা পাইল···সসঙ্কোচে বলিল—বেশ ভাই, আমার অপরাধ হয়েছে···আমাকে মাপ করুন! আর কখনো আমি এমন ছোট কথা বলে আপনাকে কষ্ট দেবো না।

—না, এমন কথা আর কখনো বলবেন না...নিজের সম্বন্ধে নয়,. ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধেও নয়!

এ-কথা বলিয়া গায়ে পাঞ্জাবি চড়াইল।

রাজেশ্বরী বলিল—চায়ের জল বসিয়েছি···চা খেয়ে বেরুবেন।

আদিত্য বলিল—রোগা ছেলে ফেলে আপনি এ-সব কাজ করতে গেছেন!

কৃত্রিম অভিমান-ভরা কণ্ঠে রাজেশ্বরী বলিল—ঐ তো···যা করবো, সব-তাতেই আপনি দোষ ধরবেন আর বকবেন! কি অশুভক্ষণেই যে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল!

আদিত্য এ-কথার জবাব দিল না···শুধু বলিল—আমি এসে চা খাবো। দেরী হলে ডাক্তার বাবু বেরিয়ে যেতে পারেন!

আদিত্য আর দাঁড়াইল না···বাহির হইয়া গেল।

রাজেশ্বরী আসিল ছেলের কাছে···বলিল—কিছু খাবি রে মনু?

ছেলে মনু বলিল—কি? বাতাসা? না, মিছরী?

—কি খেতে ইচ্ছে করছে?

—যা ইচ্ছে করছে, তুমি দেবে?

রাজেশ্বরী কৌতুক করিয়া বলিল—কি? ভাত? মাছের ঝোল? না, আমাকে?

ছেলে মনু মুখ বাঁকাইল···বলিল—না মা···ও-সবের নামে কেমন যেন বমি পায়!

রাজেশ্বরী বুঝিল, অসুখ তাহা হইলে হাল্‌কা নয়···দু'দিন ভোগাইবে! বলিল—মিছরী এনে দি?

ছেলে বলিল—বিস্কুট?

রাজেশ্বরী বলিল—না বাবা···কাকাবাবু ডাক্তার নিয়ে আসছেন। ডাক্তার বাবু এসে দেখে যদি বিস্কুট খেতে দিতে বলেন, তাহলে বিস্কুট দেবো। এখন বরং একটু মিছরী এনে দিই, খাও··· কেমন?

ছেলে বলিল—দাও...

রাজেশ্বরী মিছরি আনিয়া ছেলের হাতে দিল; তার পর দাসী খেন্তির মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—জলটা উন্মুনে ফুটছে! ওতে একটু বার্লি ঢেলে দাও তো ভাই, তোমার ছেলে খাবে।

খেন্তির মা জবাব দিল—দি বৌদি।

মিছরী খাইতে খাইতে ছেলে মন্টু বলিল,—কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি মা···একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম···সেই যে তুমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলে, তখন···

রাজেশ্বরী বলিল—কি স্বপ্ন?

ছেলে বলিল—যেন সেই দার্জিলিংয়ের বাড়ীতে আছি—কালী-মামার হুঁকো ফেলে দিয়েছি আর কালীমামা রেগে আমাকে তুলে জোর্‌সে আছাড় দিলে···উঃ, এমন লেগেছিল···পিঠে ব্যথা হ'য়ে রয়েছে!

হাসিয়া রাজেশ্বরী বলিল—পাগল ছেলে! স্বপ্নের আছাড়ে গায়ে ব্যথা হয় বুঝি রে?

—সত্যি মা, পিঠে ভয়ানক ব্যথা! বলিয়া ছেলে পিঠের এক-জায়গায় হাত দিয়া দেখাইল।

শুনিয়া রাজেশ্বরীর বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! পিঠে ও-জায়গায় ব্যথা!···তাইতো?

বলিল—সত্যি ব্যথা?

—হ্যাঁ মা···সত্যি ব্যথা! তোমাকে কি আমি মিথ্যা করে বলছি?

রাজেশ্বরীর মুখ শুকাইল…মনে নূতন দুশ্চিন্তা! জ্বরের সঙ্গে বুকে-পিঠে ব্যথা! এ-জিনিষ তার অজানা নয়। জ্বরের সঙ্গে বুকে-পিঠে এই ব্যথা লইয়াই তার চোখের সামনে দিয়া বাবা চলিয়া গিয়াছে…চির দিনের জন্য!

একটা নিশ্বাস…

দ্বারে আসিয়া মনোরমা ডাকিল—দিদি…

—মণি…এসো ভাই!

মনোরমা ঘরে আসিল। ইহারি মধ্যে তার স্নান সারা হইয়া গিয়াছে। পরণে একখানি ডুরে শাড়ী ..কপালে সিঁদূরের টিপ…মাথার ভিজা চুল পিঠের উপরে এলাইয়া দিয়াছে! পরিপাটী মূর্ত্তি!

রাজেশ্বরী বলিল—সকালেই আমার ঘরে!

মনোরমা বলিল—এসেছিলুম ঠাকুরপোর সন্ধানে! বেরিয়েছেন বুঝি?

রাজেশ্বরী বলিল—হ্যাঁ। ডাক্তারের কাছে গেছেন। ছেলেটার কাল রাত থেকে খুব জ্বর, তাই!…তা, ঠাকুরপোকে তোমার কিসের দরকার?

মনোরমা বলিল—চুপি চুপি একটা কথা বলবো।

রাজেশ্বরী বলিল—ও…আমার শোনবার মতো কথা নয়!

—না, না.. তোমাকে কেন বলবো না?…কিন্তু শুনে ঠাট্টা করবে না?

—কেন, ঠাট্টা কিসের?

সলজ্জ ভঙ্গীতে মনোরমা বলিল—১৫ তারিখ আমাদের বিয়ের তারিখ কিনা! তাই ঠাকুরপোকে বলে দেবো, চুপি-চুপি…মানে, উনি

না জানতে পারেন...আমাকে বেশ ভালো দু ছড়া গোড়ে-মালা কিনে এনে দেবেন। ওঁকে খুব চমকে দেবো কিনা!

—বটে! মুখে হাসির আলো ফুটিলেও রাজেশ্বরীর বুকের কোণে এক-টুকরা মেঘ আসিয়া চাপিয়া বসিল! হায়রে, তারো বিবাহের তারিখ আগুনের অক্ষরে বুকে লেখা আছে! একটা তারিখ নয়···দু-দুটা তারিখ! প্রথম বিবাহ হইয়াছিল মাঘ মাসের ২০ তারিখে···তখন কতই বা তার বয়স? এগারো! তার পর এক বছর বাদে সে-তারিখ ঘুরিয়া আসিবার আগেই যাকে লইয়া তারিখ, সে কোথায় চলিয়া গেল!··· এবারের তারিখ ১২ই ফাল্গুন! বিবাহের পরের বৎসর ও-তারিখ ফিরিয়া আসিল, তখন সে আঁতুড়ে···এই মনু আসিয়া তার কোল চাপিয়া বসিয়াছে।

মনোরমা বলিল—তোমাকেও সেদিন ধরবো দিদি···আমার কপালে কনে-চন্নন পরিয়ে দেবে।···তিন বচ্ছর বিয়ে হয়েছে··কোনো বছর ওঁকে কাছে পাইনি তো! তবু দেশের বাড়ীতে সকলে ঘুমোলে ওঁর ছবিতে চন্ননের ছিটে দিয়েছি!

কথার শেষে মনোরমার মুখে লজ্জার রক্তিম আভা ফুটিল!

দেখিয়া রাজেশ্বরী মনে মনে বলিল, এমনি হাসির আলো তোমার ঠোঁটে ফুটিয়া থাকুক বোন···তোমাকে দেখিয়া আমি সান্ত্বনা পাই, যে গরীবের ঘরেও সৌভাগ্য-সম্পদ আসিয়া দেখা দেয়।···এই সান্ত্বনাটুকুই আমার অভিশপ্ত জীবনে পরম লাভ!

বিমল ডাক্তার আসিলেন। আসিয়া রোগী দেখিলেন; বুক-পিঠ পরীক্ষা করিলেন।

বলিলেন, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা! ভয় নাই! বুকে-পিঠে কোনো কন্‌জেশন্ নাই। দু-চার দিনে সারিয়া যাইবে!

ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—আদিত্য নিজে গেল ঔষধ কিনিতে।

সকাল বেলাটা এমনি করিয়া গোলে-মালে কাটিল। দুপুর বেলায় আদিত্য খাতা লইয়া বসিল। সেই "ভবিষ্যৎ" উপন্যাসের খাতা!

পঁচিশ পরিচ্ছেদ লেখা হইয়া গিয়াছে···ছাব্বিশের পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে।...

পঁচিশে লিখিয়াছে :—

নায়িকা যমুনা আছে তার বাপের কাছে বাপের বাড়ীতে···ডেপুটি নায়ক প্রভাকর বদলি হইয়া উলুবেড়িয়ায় গিয়াছে···দুজনে দেখা-সাক্ষাৎ নাই প্রায় ছ মাস! পঁচিশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছে, বদলি হইয়া উলুবেড়িয়ায় যাওয়ার আগে প্রভাকর আসিয়া একটা হোটেলে বাসা লইয়াছিল—ধনী শ্বশুরের গৃহের ত্রিসীমায় যায় নাই! এ কয় দিনের জন্য বৌদিকে সে রাখিয়াছিল তার এক পিসিমার গৃহে···উত্তরপাড়ায়। প্রভাকরের শাশুড়ী এ-সংবাদ পাইয়া মেজ ছেলেকে প্রভাকরের কাছে পাঠাইয়াছিলেন—শ্বশুর-বাড়ীতে রাত্রি-বাস না করুক, রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া না হয় চলিয়া আসিবে! এ নিমন্ত্রণের উত্তরে প্রভাকর সখেদে জানাইয়াছিল, তার সময় নাই···তাঁকে উত্তরপাড়ায় যাইতে হইবে···বৌদির পিসে-মশায় বৌদির ছেলেদের জন্য তাদের মাতামহ-দত্ত যৎকিঞ্চিৎ বিষয়-সম্পত্তি আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন, সেজন্য পরামর্শাদি করিতে পিসে-

মশায় প্রভাকরকে একবার সেখানে যাইতে লিখিয়াছেন ইত্যাদি। না যাইতে পারার দরুণ বহু মিনতি জানাইয়াছেন···তার অবস্থা বুঝিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী যেন তাহাকে ক্ষমা করেন। আরো বলিয়াছিল যে উলুবেড়িয়ায় যাওয়ার আগে যদি অবকাশ ঘটে,তাহা হইলে গিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পায়ে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করিয়া আসিবে নিশ্চয়··· নিশ্চয় !·· তারপর আর যাওয়া ঘটে নাই !

পঁচিশে এই পর্য্যন্ত লিখিয়া এবার ছাব্বিশ সুরু করিবার কথা। ভাবিল, এ অবস্থায় নায়িকা যমুনার মনে কি আঘাত লাগিয়াছে, তাহা লইয়া সুরু করিবে, না, প্রভাকরকে ধরিবে ! খাতা খুলিয়া সে ভাবিতে বসিল···এমন সময় সজ্জিত বেশে মনোরমার প্রবেশ।

বেশভূষা দেখিয়া আদিত্য সবিস্ময়ে তার পানে চাহিয়া বলিল—হঠাৎ বহুরূপী সেজে সামনে দাঁড়ালেন যে !

—বহুরূপী !

আদিত্য বলিল—সম্পর্কে বাধে···নাহলে অন্য উপমা মনে আসছিল ,

কৌতুক-ভরে মনোরমা বলিল—কি উপমা, শুনি ?

আদিত্য বলিল—বলতুম, আমি ধ্যানে বসেছি···প্রভাকর আর যমুনার ভাগ্য-রচনার ধ্যানে...আর আপনি এলেন উর্ব্বশী-মেনকা-তিলোত্তমার বেশে সে-ধ্যান ভাঙ্গতে !

কৃত্রিম ক্রোধে মনোরমা বলিল—রীতিমত মানহানি !···আমি ভদ্র-মহিলা···আমাকে বলা হচ্ছে উর্ব্বশী তিলোত্তমা !

আদিত্য বলিল,—বলিনি তো···কবিতা লিখলে ঐ কথা হয়তো লিখতুম !

—বটেই তো! কবিতায়-গল্পে বৌদিদের মান-সম্ভ্রম নেই…না? তাদের নিয়ে আপনারা তাই এমন সব অকথা-কুকথা লেখেন!

আদিত্য বলিল,—সর্ব্বনাশ! আর যে-কোনো লেখক এমন কথা লিখুন, আমার সম্বন্ধে এত-বড় অপবাদ দেবেন না বৌদি…এমন অপবাদ ভোগ করবার মতো শক্তি বা সৌভাগ্য পরে কখনো লাভ করবো কিনা, জানিনা…তবে এ পর্য্যন্ত আমার কোনো গল্পে বা উপন্যাসে কোনো বৌদিকে নিয়ে এমন রসিকতা আমি করিনি।… কিন্তু ও-সব কথা যাক… হঠাৎ এমন সাজগোজ?

মনোরমা বলিল—নেমন্তন্ন যাচ্ছি। আমার এক মাসতুতো বোন …খুব বড় লোকের বাড়ী তার বিয়ে হয়েচে…বালিগঞ্জে…সেই বোনের ছেলের ভাত…আমাকে নিয়ে যেতে গাড়ী পাঠাবে।

—ও…তাহলে অভাগা ঠাকুরপোকে ভুলবেন না বৌদি। তার জন্য আঁচলে কিছু বেঁধে আনবেন।…আর কিছু না পারেন, কিছু মিষ্টান্ন অন্ততঃ! জানেন তো, শাস্ত্রে বলেছে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ! অর্থাৎ মিষ্টান্ন শুধু ইতর-জনের জন্য!

হাসিয়া মনোরমা বলিল—সত্যি আপনার এ-কথা আমি বলবো আমার বোনকে।…সেও কবিতা লেখে…মাসিকপত্রে তার কবিতা ছাপা হয়। তার নাম হলো বকুলমালা দেবী। তাকে বলবো, লেখক আদিত্য বাবু আমার ঠাকুরপো…আমাকে তিনি বলেছেন, তাঁর জন্য খাবার নিয়ে যেতে হবে ভাই!

আদিত্য বলিল—তা যা খুশী বলবেন 'খন, আমার মিষ্টান্ন পাওয়া নিয়ে কথা।

মনোরমা বলিল—আমার জন্য একটি কাজ করতে হবে, ঠাকুরপো !

—বলুন···

—১৫ তারিখে দু ছড়া বেশ ভালো গোড়ে মালা আমাকে এনে দিতে হবে। কিন্তু খুব চুপি-চুপি···উনি যেন আগে থেকে তার এতটুকু আভাস না পান !

—বুঝেছি। বেশ, এনে দেবো।

তার পর মনোরমা বলিল—আজ সকালে খেতে বসে উনি বলছিলেন, দ্যাখো না বেচারার বরাত ! ১৩ তারিখে বিয়ে হবার কথা··· ভালোবাসার বিয়ে···তা সে বিয়েতে দ পড়ে গেল ! কবে যে ফের তারিখ ঠিক হবে ! তা ছাড়া ওখানে বিয়ে হবে, কি, হবে না···

আদিত্য বলিল—বিয়ে না হয়ে ভালোই হয়েছে বৌদি !

—ভালো কিসে, শুনি ?

—বিয়ে করলেই নানান্ জ্বালা। আপনাদের মনের মধ্যে কোনো দিন আমরা প্রবেশ করতে পারলুম না···পারবোও না কোনোদিন !

—তার মানে ?

—মানে, আপনার মনোরঞ্জন করাকেই তো উমেশদা তাঁর জীবনের ব্রত করেছেন, বলুন দিকিনি সত্যি কথা, আপনার মনের নাগাল তিনি যথার্থই কি পেয়েছেন ?

খিল-খিল করিয়া হাসিয়া মনোরমা বলিল—মন নিয়ে কি যে আপনারা এত মাথামুণ্ডু লেখেন, আমি তার কিছুই বুঝি না ঠাকুরপো। এই তো ভাই, যখন বিয়ে হলো, ওঁর সঙ্গে আমার বয়সের কত তফাৎ, সেজন্য অনেকে বলেছিল, দুজনের মনে-মনে মিল হবে না ! শুনে আমার

খুব ভয় হয়েছিল...কিন্তু এতকাল একসঙ্গে বাস করছি, মনে-মনে মিল, কি, অমিল, তার কিছুই বুঝলুম না···তবু আমার দুঃখ তো কিছুই নেই !

—হুঁ ! বলিয়া আদিত্য চাহিল নিষ্ঠার অবিকল নেত্রে মনোরমার পানে।

মনোরমা বলিল—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ঠাকুরপো ? সত্যি জবাব দেবেন ?

—বলুন। আপনার প্রশ্ন আগে শুনি। তার পর প্রশ্ন বুঝে তার জবাব।

মনোরমা বলিল—সে-মেয়েটির নাম শুনেছি জাহ্নবী। তার সঙ্গে বিয়ের কথা সত্যি ভেঙ্গে গেছে ?

আদিত্য জবাব দিল—এক-রকম গেছে বৈ কি।

—সে কি ! এতখানি ঠিকঠাক হয়েও ?

আদিত্য বলিল—যে-বিয়েয় কন্যাপক্ষ শুধু পাত্রের টাকার দিকে চেয়ে টাকা খোঁজে, সে-পাত্রটি মানুষ কি না দ্যাখে না···সেখানে···

—কিন্তু গোড়ায় সব জেনেশুনেই তো এ-বিয়ে ঠিক হয়েছিল, ভাই !

—হয়েছিল। তার পর জানেন তো···there's many a slip between the cup and the lip.

—আবার বিদ্যা ফলাচ্ছেন ! আমি ভাই মুখ্যু মানুষ !—ও কথার মানে বলে দিন মশাই, নাহলে আমি কিছুই বুঝবো না।

বাহিরে মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হর্ণ বাজিল ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ !

আদিত্য বলিল—মানে শোনবার আর সময় মিললো না! ঐ বাঁশরী বাজিল যমুনায়!

—তাহলে আসি। এসে মানে শুনবো কিন্তু, ছাড়বো না!

মনোরমা চলিয়া যাইতেছিল···হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—যাচ্ছি কিন্তু আপনার কথা ভুলবো না। গিয়ে আমার বোনকে আমি ঠিক বলবো আপনার মিষ্টি চাওয়ার কথা!

আদিত্য বলিল—নিশ্চয় বলবেন। ব্রাহ্মণ আমি···খাওয়ার নিমন্ত্রণ চেয়ে নিতে আমার লজ্জা করে না...এতে আমি গৌরব বোধ করি।

মনোরমা দাঁড়াইল না···হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

পথে মোটরের ষ্টার্ট···তারপর গাড়ী চলিল।

সামনে খাতার পাতা খোলা···আদিত্য বসিয়া আছে বাহিরের দিকে চাহিয়া···দৃষ্টি উদাস! হঠাৎ অদূরে কোন্ বাড়ীতে বাজিল বিবাহের শানাই···

আদিত্যর বুকখানা যেন দুলিয়া উঠিল! খাতা বন্ধ করিয়া গায়ে পাঞ্জাবি-জামা চড়াইয়া সে আসিল রাজেশ্বরীর ঘরের সামনে...ডাকিল—বৌদি···

ভিতর হইতে রাজেশ্বরী বলিল—ঠাকুরপো!...আসুন···

আদিত্য ঘরে ঢুকিল।

বিছানায় শুইয়া আছে মনু···দুচোখ বুজিয়া। তার মাথার শিয়রে বসিয়া রাজেশ্বরী···ছেলের মাথায় জলপটি দিতেছে!

আদিত্য বলিল—জ্বর বেড়েছে?

—হুঁ...খেয়ে এসে দেখি, আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে!

আদিত্য বলিল—আমি রয়েছি পাশের ঘরে, আমাকে বলেন নি! যাই, ডাক্তারকে গিয়ে বলি।

তার পর রাজেশ্বরীর উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া রোগীর ব্যবস্থা করিয়া আদিত্য নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না···ট্রামে চড়িয়া বসিল···এবং ট্রামে চড়িয়া নামিল গিয়া ভবানীপুরে জোগুবাবুর বাজারের সামনে।

বকুলবাগানে চিন্তাহরণ বাবুর সেই গৃহ। এ-গৃহের দ্বার এতকাল ছিল অবারিত। ফটক বন্ধ···বাড়ীতে জনপ্রাণী কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না! ফটকের মধ্যে গাড়ী-বারান্দা। বারান্দার ওপাশে রোয়াক ···রোয়াকে বসিয়া চাকর-বাকররা তাস খেলিতেছে। চিনিল, ঐ নাগিনা...

বাহিরের চেহারা দেখিয়া মনে হয় না, এ-বাড়ীতে এ-সপ্তাহে কন্যার বিবাহ হইবে· একমাত্র কন্যার বিবাহ।

ইহার অর্থ? ১৩ তারিখে জাহ্নবীর বিবাহ তাহা হইলে বন্ধ?

বন্ধ হোক, বিবাহ হোক···আদিত্যর কি! কেন তার এ দুর্ব্বলতা? না...না···না! মনকে চাবুক মারিতে মারিতে আদিত্য বেশ দ্রুত পদ-সঞ্চালনে চলিয়া আসিল।

কুড়ি

রাত্রিবেলা…তখন নটা বাজে।

আদিত্য বসিয়া একাগ্র মনোযোগে উপন্যাস লিখিতেছে। মনের দ্বার আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে…মনে জাহ্নবীর চিন্তাটুকুকে আর প্রবেশ করিতে দিবে না! মনের মধ্যে ভবিষ্যৎ-উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের পুরিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছে…তাহাদের লইয়া আজ রাত্রি কাটাইয়া দিবে। এ বই আজ লিখিয়া শেষ করিবেই। কাল গিয়া সুধীর বাবুকে লেখা দিয়া বাকী তিনশো টাকা…

তবুও জাহ্নবী আসিয়া মনের দ্বারে দাঁড়ায়…ছায়ার মতো ঘুরিয়া বেড়ায়! আদিত্য বলে, না, না…জাহ্নবী যেখানে আছে, সেইখানেই থাকুক…সুখে সে থাকুক! আদিত্যর কাছে জাহ্নবী আজ…কল্পনা মাত্র!

মনোরমা আসিয়া ডাকিল—ঠ'কুরপো…

—আঃ…লিখতে দেবেন না আমাকে?

—ও…কিন্তু আমি শুধু একটা কথা বলতে এসেছি।

—বলুন চট্‌পট্‌…বলে আমাকে ছুটি দিন !…আমার মাথার মধ্যে উপন্যাসের মানুষগুলো যেন মার্চ্চ করে চলেছে !…মাথায় ভাব এসেছে ! বুঝলেন, যাকে বলে, বন্যা !

মনোরমা বলিল—আমার বোন সত্যিই আপনার জন্য খাবার দেছে …আপনার সে ভয়ঙ্কর ভক্ত ! বললে, একদিন এসে আপনাকে দেখে যাবে…আপনার সঙ্গে আলাপ করবে !

—নাঃ…আপনি পাগল করবেন দেখছি, বৌদি ! আমি কি আলি-পুরের জু-গার্ডেন যে আমাকে তিনি দেখতে আসবেন !

হাসিয়া মনোরমা বলিল—আলিপুরের সে-বাগান যেমন দেখবার, আপনিও তেমনি দেখবার জিনিষ। নয় কি ?…সে-বাগানের মধ্যে যেমন কত পাখী জন্তু-জানোয়ার—আপনার মনের মধ্যেও তেমনি কত টিয়া-চন্ননা, সাপ-বাঁদর কিল-বিল করছে !

আদিত্য হাসিল, বলিল—চমৎকার কথা বলেছেন ! খাশা ! এখন শেষ হয়েছে আপনার কথা, যাবেন দয়া করে ?

—যাচ্ছি, যাচ্ছি…এমন করে মানুষকে তাড়াতে নেই ঠাকুরপো ! মানুষ হলো লক্ষ্মী। …যাবার আগে বলে যাই, দিদির কাছে দিয়েছি আপনার মিষ্টির হাঁড়ি।…মনু এখন একটু ভালোই আছে দেখলুম। জ্বরটা ছেড়েছে।

—ভালো…

মনোরমা চলিয়া আসিল…আদিত্য লিখিতে লাগিল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ! কোনোমতে ধ্যান হইতে আদিত্যকে তুলিয়া আনিয়া রাজেশ্বরী খাওয়াইতে বসিয়াছে।...খাইয়া আবার গিয়া লিখিতে বসিবে।

রাজেশ্বরী বলিল—মণি একরাশ খাবার নিয়ে এসেছে।

—শুনেছি! কিন্তু ভাববেন না, দরদ করে' এনেছেন! আমি আনতে বলেছিলুম বৌদি। বুঝলেন, ভিক্ষালব্ধ ধন!

রাজেশ্বরী চাহিল মনোরমার ঘরের দিকে। ডাকিল—মণি···শুনছো?

মনোরমা ছিল রাজেশ্বরীর ঘরে···মন্টুর কাছে। বলিল—কি?

রাজেশ্বরী বলিল—খাবার নিয়ে এলে, তার জন্য কৃতজ্ঞতা নেই! ঠাকুরপো বলছেন, ভিক্ষালব্ধ!

মনোরমা বাহিরে আসিল, বলিল—বটেই তো! চান না গিয়ে ভিক্ষা···আরো তো অনেক বাড়ী রয়েছে, মানুষ-জনও রয়েছে...কে ওঁকে এমন হাঁড়ি ভরে খাজা-গজা সন্দেশ-মতিচুর দেয়, দেখি। সত্যি দিদি, সেখানে কত বাড়ীর মেয়ে এসেছিল···আমি বেশ অহঙ্কার করেই এ-কথা বললুম! বললুম, মস্ত লেখক আদিত্য বাবু আমার দ্যাওর হন্···এক বাড়ীতে আমরা থাকি! অমনি চারদিক থেকে আমাকে সব ছেঁকে ধরে কত কথাই না জিজ্ঞাসা করতে লাগলো! তিনি দেখতে কেমন, বয়স কত, তাঁর স্ত্রীটি সুন্দরী কি না, তিনি কি খান, কখন লেখেন··· কি করে' লেখেন···এমনি হাজার কথা! যেন মৌচাকে ঢিল ছুড়েছি আমি! দু'তিনটি মেয়ে···গহনা-শাড়ীর ভারে ঠিকরে ছিল···তারা এ-কথা শুনে আমার সঙ্গে ভাব করতে এলো। বললে, একদিন এ বাড়ীতে আসবে···ওঁকে দেখতে···ওঁর সঙ্গে ভাব করতে! বাইরে ওঁর

কী আদর!...দেখে সত্যি আমার যেমন আহ্লাদ হলো, তেমনি অহঙ্কার!

হাসিয়া আদিত্য বলিল—স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! সত্যি আমাকে তাঁরা দেখতে আস্‌বেন না কি বৌদি?

—আসবেই তো! বলিল মনোরমা।

—যেদিন আসবে, আগে থেকে আমাকে নোটিশ দেবেন। বাজার ঘুরে সেদিন আমি খানিকটা পাট, চিটেগুড় আর কালির ভুষো কিনে আনবো।

—সে সব কি হবে, শুনি?

—গায়ে চিটেগুড় মেখে তার উপর ঐ পাট জড়াবো···আর মুখে মাখবো কালির ভূষো। মানে, এসে যদি তাঁরা দেখেন, আর-পাঁচজনের মতোই আমি দেখতে···আর পাঁচজনের সঙ্গে আমার চেহারার তফাৎ নেই, তাহলে তাঁরা নিরাশ হবেন যে!

—ও! চালাকি করছেন!...জানেন না তো, আমাদের কাছে আপনি যত সাধারণই হোন্, বাহিরের পাঁচজনে আপনাকে কি চোখে দেখে!

—হুঁ···দুঃখ এই যে তাঁদের সে বাইরের চোখ যদি আমি পেতুম।

মনোরমা বলিল—পেলে কি করতেন?

—আয়নায় নিজের চেহারা দেখে খুশী হতুম।

—বটেই তো!

ভবিষ্যৎ

পরের দিন।

ডাকে একখানা চিঠি আসিল। রাজেশ্বরীর নামে···কেয়ার অফ শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্য চৌধুরী। চিঠিখানা আসিয়াছে আদিত্যর সেই আগেকার মেশের ঠিকানা ঘুরিয়া রি-ডাইরেক্ট হইয়া। চিঠি লিখিয়াছে কালী হালদার। লিখিয়াছে,—

কল্যাণীয়াসু

পরে রাজু ছেলেমেয়েদের লইয়া এখান হইতে যাওয়া ইস্তক তোমাদের কোন সংবাদ না পাইয়া আমরা অত্যন্ত ভাবিত আছি। ছেলেমেয়েরা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে বাড়ী যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে। আদিত্য বাবু এখানে যে হোটেলে থাকিতেন, সেই হোটেলের ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার কাছ হইতে আদিত্য বাবুর ঠিকানা জানিয়া তবে তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি!

আশা করি, সেখানে তোমরা সকলে বেশ কুশলে আছো। আদিত্যবাবু অতিশয় সজ্জন ভদ্রলোক। তিনি নিশ্চয় তোমাদিগকে বিশেষ আদর-যত্ন করিতেছেন। তিনি তোমার দেবর এবং ভদ্রলোক বলিয়া এবং তাঁহার কাছে তোমাদের কোনরূপ অযত্ন হইবে না ইহা বুঝিয়াই তাঁহার সঙ্গে তোমাদের নির্ভাবনায় পাঠাইতে পারিয়াছি।

একটি শুভ সংবাদ আছে। জামাই ভায়া অর্থাৎ মাণিক্য ভায়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন অর্থাভাবে নিজেকে ধিক্কার দিয়া কাহাকেও না বলিয়া তিনি একখানি জাহাজে সামান্য খালাসীর কাজ লইয়া কলম্বো গিয়াছিলেন। সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন এবং কলিকাতায় ভালো চাকরি মিলিয়াছে। লিখিয়াছেন, বেতন বেশ ভালো এবং তোমাদের খরচ-পত্রের জন্য আমার নামে মণি-অর্ডার করিয়া দুই শত টাকা পাঠাইয়াছেন।

তুমি জানো মাণিক্যর দেনদাররা কিরূপ উৎপাত করিয়া বেড়ায়। মাণিক্যর নামে যত্র-তত্র বহু কটু কথা বলে। সে সব কথা শুনিয়া লজ্জায় মুখ দেখানো ভার হয়। তাছাড়া তাদের ন্যায্য পাওনা চুকাইয়া না দিলে মহাপাতক হইবে। সেইজন্য

সে দুইশত টাকায় আমি মাণিক্যর ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছি। মাণিক্যকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছি তোমার দেবর আদিত্যবাবু দার্জ্জিলিংয়ে হাওয়া খাইতে আসিয়া তোমাদের সংবাদ পাইয়া যত্ন করিয়া তোমাদের তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। আদিত্য বাবুর কলিকাতার বাসার ঠিকানাও মাণিক্যকে লিখিয়া জানাইয়াছি। মাণিক্য যেন সে-ঠিকানায় তোমাদের সংবাদ দেয়—এ-কথাও বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিয়াছি।

ভগবানের কাছে প্রতিনিয়ত তোমাদের কুশল প্রার্থনা করি, জানিবে। মাঝে-মাঝে সংবাদ দিয়ো। পাতানো সম্পর্ক নয়—আমরাই তোমার একমাত্র পরমাত্মীয়—এ-কথা ভুলিয়া যাইয়ো না।

মাণিক্য আসিলে সংবাদ জানাইয়ো—গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিব। কতকাল দেখি নাই—তাহার জন্য মনে একতিল শান্তি নাই, জানিবে। তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। পত্রোত্তরে কুশল জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক
শ্রীকালীপদ হালদার

চিঠি পড়িয়া রাজেশ্বরীর দুচোখে অশ্রুধারা বহিল।

আদিত্য বলিল—র‍্যাসকেল!

মনোরমা বলিল—কাকে গাল দিচ্ছেন?

—এই ব্যাটা কালী হালদারকে! ব্যাটা ধর্ম্মপুত্তুর···দুশো টাকা দিয়ে পরের দেনা শোধ করে ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন, লিখেছেন! টাকাটা ব্যাটা গেণ্ডাফাই করে দেছে! চিঠি লিখেছে দেখুন না·· মায়ার সমুদ্দুর বইয়ে দেছে একেবারে!

তার পরের দিন···

আদিত্য লেখা প্রায় শেষ করিয়াছে আর গোটা দুই পরিচ্ছেদ বাকী! বেলা বারোটা বাজিল, আঙুলগুলা টন্‌টন্ করিতেছে, নিশ্বাস

হাসিয়া আদিত্য বলিল,—আপনি ক্ষেপেছেন বৌদি! ওঁরা তো বর দেখতে আসেন নি। এসেছেন বাঙলা দেশের এক গরীব লেখককে দেখতে!

মনোরমার সঙ্গে ঘরে আসিল মনোরমার মাসতুতো বোন বকুলমালা ···বকুলমালার সঙ্গে তার এক তরুণী বান্ধবী। এবং রাজেশ্বরী সকলের পিছনে!

মনোরমা বলিল,—এঁরা লেখক, আদিত্যবাবুর ভক্ত···আদিত্যবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আর ভাব করতে এসেছেন। আপনার ভয়ঙ্কর ভক্ত এঁরা···চোখ তুলে চেয়ে দেখুন ঠাকুরপো!

লজ্জায় আদিত্য যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোনোমতে মুখ তুলিয়া চাহিল। চাহিতেই দেখিল, মনোরমার মুখে হাসির বিদ্যুৎ-বিভা। ভাবিল, বাঙলার মেয়ে···বি-এ এম-এ পাশ না করুক, তার বুদ্ধিতে কি উজ্জ্বল দীপ্তি!

মনোরমা বলিল—পরিচয় করিয়ে দি। এটি আমার মাসতুতো বোন শ্রীমতী বকুলমালা দেবী···মাসিক-পত্রে পদ্য লেখেন।

বকুল কৃতাঞ্জলি-পুটে নমস্কার জানাইল।

আদিত্য বলিল—নমস্কার।

বকুলের পিছনে বকুলের সেই বান্ধবী। তার হাত ধরিয়া টানিয়া তাকে সামনে আনিয়া মনোরমা বলিল—আর ইনি···বকুলের বন্ধু···নাম শ্রীমতী···